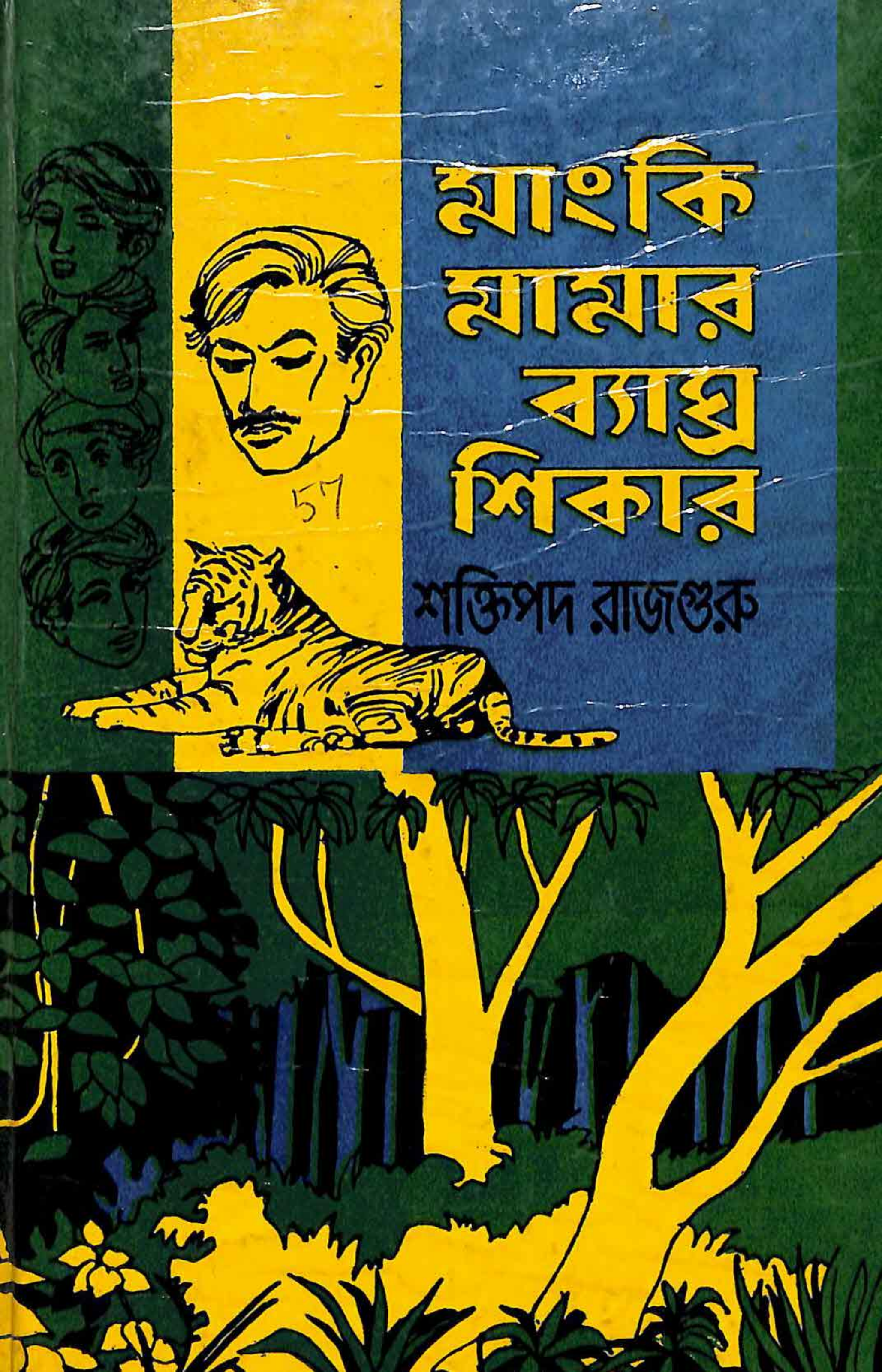

মাংকি
মামার
ব্যাঘ্র
শিকার
শক্তিপদ রাজগুরু
57

মাংকিমামার ব্যাঘ্র শিকার

শক্তিপদ রাজগুরু

লিপিকা
৩০/১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
ডি. চক্রবর্তী
৩০।১এ, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
বইমেলা, ১৩৯৫

প্রচ্ছদ ঃ
শ্যামদুলাল কুণ্ডু

মূল্য—বার টাকা

মুদ্রক ঃ
গৌর মান্না
দেবাশিস প্রেস
৯১৭ বি, প্যারীমোহন সুর লেন
কলিকাতা-৬

কেষ্টমামা গর্জন করে ওঠে বাজখাঁই গলায়—এ্যাই গর্দভের দল, চুপ কইরা থাক।

কেষ্টমামার গর্জনে আমাদের আড্ডার প্রাণীদের অবশ্য কিছু আসে যায় না। ফুচকা আলুকাবলিওয়ালাকে ঘিরে তখন হিসেবের পালা চলেছে। ক্যাবলার মুখে তেঁতুলজল ভর্তি টস্‌টসে ফুচকা, ওর হাঁ করা চোয়াল গড়িয়ে রস ঝরছে। তবু কট কট করে বলে সে—

চুপ কইরাতো আছি কিষ্টমামা। শুনছি তোমার কথা?

ক্যাবলা এর মধ্যে ফুচকাওয়ালার দিকে চোখবুজে শালপাতার পাত্রটা এগিয়ে দিয়েছে আর একটা ফুচকার আশায়। পটলা কথাবার্তা কম বলে, কারণ একটু বেসামাল হলে জিবটা ওর আলটাক্‌রার সঙ্গে সেঁটে যায়। আর কোনমতে মাথায় থাবড়া টাবড়া মেরে সেটা মুক্ত করতে হয়।

তবু পটলা বলে—ত তোমার কথা শুনবো না ম····মা····মা—

আমি এককোণে চুপ করে বসে আছি। আজকের ফুচকার এই খরচাটা আমার ঘাড় ভেঙেই আদায় করেছে ওরা। কোনরকমে ছোটদার কাছ থেকে ক'দিন ধরে ভজিয়ে ভাজিয়ে তিনটে টাকা ম্যানেজ করেছিলাম। ওরা তারই সন্ধান পেয়ে জোর করে বের করে নিয়েছে।

আর টাকার খবরটা দিয়েছিল পটলাই।

তাই পটলার কথায় গা জ্বলে যায়। আমি বলে উঠি, বোকা-পাঁঠার মত ম্যা ম্যা করিস না পটলা, এখন কেষ্টমামা যা বলছে শোন।

কেষ্টমামার দেহখানা লম্বা বাখারির মত। ঢক্‌ঢকে আর তেমনি লিকলিকে। গলাখানা ফাটা বাঁশের মত শক্ত আর তেমনি ভরাট। ওর থেকে যখন শব্দ বের হয় মনে হবে ফাটা কাঁসর বাজছে।

উনি কিছুদিন যাবৎ আমাদের কুলে পাড়ায় এসে হাজির হয়েছে। চাকরীর সন্ধানে এখন নাকি ব্যস্ত।

আমি বলি—হোঁৎকা এখনও এল না র‍্যা ?

হোঁৎকা না হলে আসর জমে না। কেষ্টমামা হোঁৎকার নাম শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে ওঠে।

হোঁৎকার কামটা কি ?....অরে পালোয়ান কইছস ? সোন্দরবনে অমন পালোয়ানের কাম নাই। হালায় কুঁদা বাঘগুলান ওরে দেখলে আগেই ঘাড় মটকাইবার চাইবো। অর্থাৎ হোঁৎকাকে ও নিয়ে যেতে নারাজ।

কেষ্টমামা বলেছে তার অভিজ্ঞতার কথা। ওর এক দাদা নাকি মস্ত শিকারী। সুন্দরবনের বাঘও তাকে চেনে।

হোঁৎকা এমন সময় ধ্যাড়ধ্যাড়ে সাইকেল নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। ওর সাইকেলে ব্রেক বেলের বালাই নেই। বেশ মজবুত পেটানো শরীর হোঁৎকার আর মাথার চুলগুলো কুস্তি করার জন্য কদমছাঁট করে ছাঁটা।

—বাঘে কাকে চেনে র‍্যা ? কেষ্টমামার দাদাকে ?

কেষ্টমামা ফোঁস করে ওঠে।

—কলকাতার পোলা তগোর বন-ফরেস্ট সম্বন্ধে কি জ্ঞানডা আছে 'ক ? যাবি সোন্দরবনে—দেখবি মজাখান্ ? কলকাতাইয়া ফুটানি বাইর হইয়া যাইবগিয়া।

পটলাও মাথা নাড়ে, ইদানীং কেষ্টমামার ভক্ত হয়ে উঠেছে সে। তাই বলে—ঠ, ঠিক্ কইছো।

কেষ্টমামা ফুচকাটা কোঁৎ করে গিলে আর একটা ফুচকা মুখে পুরে শোনায়—সেইবার একখান্ বাঘ তো এক বাওয়ালিরে চোট্ করছে। বিরাট বাঘ আর তেমনি তার হাঁকাড়ি। মুখে কইরা লাশখান্ নিয়ে যাবার সময় দাদার এক দাবড়ানি শুনে যা করল রে মুশায়—

কেষ্টমামা এই ফাঁকে মুখের মধ্যে ফুচ্ ফুচ্ করে দুটো ফুচকা চালান করে দিয়ে কোঁৎ কোঁৎ করছে।

হোঁৎকা শুধোয়—কি করল বাঘটা—

কেষ্টমামার ওই শীর্ণ দেহটা আগাগোড়া ফাঁপা—এর মধ্যে ডজন তিনেক ফুচ্কা আর আধহাঁড়ি তেঁতুলজল গিলেছে, আমার টাকার এমনি গতি হবে ভাবিনি।

কেষ্টমামা সামলে নিয়ে বলে—এক্কেবারে দাদারে দেইখা মুখের শিকার না। ফেইলা প্যাণ্টুল 'বাসন্তী কালার' কইরা ফেললো—

হোঁৎকা বলে—ধ্যাৎ, বাঘ-এর প্যাণ্টুল জুটবে কি করে?

কেষ্টমামা বিজ্ঞের মত বলে—জোটে মুশায় জোটে, তার আগে ব্যাটা বাঘ একটা প্যাণ্টুল পরা শিকারীকে মারছিল। সেই ব্যাটার প্যাণ্টুলটা আর গেল্নের ক্ষ্যামতা হয়নি। ওইখান্ই বাঘটার কোমরে সাইটা ছিল। বুঝছস্ হ্যাঁদারাম।

হাসি চাপতে পারি না ওর এই আবিষ্কারে।

তাই কুক্ করে একটু হাসির শব্দ বের হয়ে পড়তেই কেষ্টমামা ধমকে ওঠে। হাসস্ ক্যান? মর্কট।

হোঁৎকা বলে—কর্কটক্রান্তির সীমানা পার হয়ে গেছে কিনা, তাই।

কেষ্টমামা গম্ভীরভাবে শুধোয়—হেটা আবার কি?

—মর্কটের ভাই কর্কট। হোঁৎকা গম্ভীরভাবে জানায়। আমার হয়ে ওকালতি করার ভান করে সে।

—পোলাপানের কথা যেতে দাও কেষ্টমামা। তাহলে কাজের কথায় এসো।

হোঁৎকা বেশ গম্ভীর হয়ে কাজের কথাই পাড়তে চায়।

পটলা বলে—সুন্দরবন যাবার প···প্ল্যান হচ্ছে, ফ···ফাইন জায়গা। হোঁৎকা মুখখানা বোদা করে বলে।

—এত জায়গা থাকতে শেষকালে ওইখানে যেতে হবে। বাঘের গপ্পো তো শুনলাম।

কেষ্টমামা এইবার অবজ্ঞার হাসি হেসে বলে—ছাগল—ছাগল ওসব। আমার লগে যাবি তোরা, তোগোর ভাবনাডা কি?

ভাবখানা এমনি যে বাঘ-টাঘ সবই তার পোষ মানানো। ও যেন ন্যাশন্যাল সার্কাসের রিং মাস্টার, একটা দড়ির চাবুক ফটাস্ ফটাস্ করে একপাল বাঘকে পোষ মানিয়ে ডেলি ডুটো শো খেলা দেখাচ্ছে।

আমি জানাই—ভাবনার কিছুই নাই, প্যাটে গেলেই সব ভাবনার দফা গয়া।

হোঁৎকাকে চুপ করে থাকতে দেখে কেষ্টমামার সাহস হয়—তোরা 'কাওয়ার্ড'—ভীতু। সঙ্গে কিষ্ট সাহা থাকতে তোগোর ভয় নাই। তালে সব বন্দোবস্থ কইরা ফেলি। পটলা ওটা কি যায় রে?

আইসক্রিমওয়ালা আমাদের দেখে এই দিকেই আসছে। আর পড়বি তো পড় কেষ্টমামার চোখেই পড়েছে।

হোঁৎকা বলে—পচা দুধের মালাই—

কেষ্টমামা বলে—তাই একখান দিতে বল? ওদিকে সুন্দরবনের এতো হাঙ্গামা পোয়াবার লাগবো।

আমি ঘাবড়ে যাই। তিনটাকা পুঁজি কখন শেষ হয়ে গেছে। আর পয়সাও নেই। তাই বলি—কুল্‌পি খুব খারাপ জিনিস কেষ্টমামা।

পটলা এখন কেষ্টমামার দলে। সে আগ্‌ বাড়িয়ে বলে—এক আধটু খেলে আর কি হবে? কেষ্টমামা চাইছেন দে, হোঁৎকার দিকে চাইলাম। হোঁৎকা চোখটা ফিরিয়ে নিল। অর্থাৎ বন্ধুর জন্য তারও কোনো দরদ নাই।

কেষ্টমামা বলে—কুল্‌পি তোগোর কলকাতায় খাবার এতো হাঙ্গামা, আর আমাগোর বিক্রমপুর পরগণায় পৌষ মাসে যাবি, তরে হক্কালেই কুলপি খাওয়াইমু। হক্কালে আমিও খাইছি।

—রোজ সকালে কুল্‌পি খেয়েছো? হোঁৎকা এবার জেরা করে।

কেষ্টমামা বিজ্ঞের মত হেসে বলে—ক্যান খামু না? শীতে দাঁত খইসা যায় আমাগোর হ্যাশে। হক্কালে দুধ দুইবার লগে যাও, গরুর বাঁট দিয়াই কুল্‌পি বাইর হয়।

হেসে উঠি—তাই নাকি?

কেষ্টমামা ততক্ষণে শালপাতায় একটা নধর সাইজের ছাড়ানো মর্তমান কলার মত একটা কুল্‌পি নিয়ে লকলকে জিব বের করে চাটতে শুরু করেছে। পটলাকেও নেমন্তন্ন করে।

—লও পটল, তুমিও একটা লও।

দামটা কে দেবে তার ঠিক নেই, ও দিব্যি গিলতে শুরু করেছে। ওকে চটাতেও পারি না। সুন্দরবন নিয়ে নাও যেতে পারে। তাই চুপ করে ওর সব জুলুমই সহ্য করতে হয়।

হঠাৎ পীতাম্বরকে ঢুকতে দেখে চাইলাম। পীতাম্বর কবিতা লেখে, ওর হাতে দলাপাকানো একটা ছোট বই মত। হাঁপাচ্ছে পীতাম্বর, বুঝলি হোঁৎকা—ছ্যাখ।

কাগজখানা মেলে ধরতে বুঝতে পারি বড় রাস্তার ওদিকের কোন হরিহর সেনের গলির সার্বজনীন ঘেঁটু পূজার স্মারকপত্রিকা। প্রচ্ছদে একটা বিরাট জালার ছবি আঁকা—উনিই নাকি জাগ্রত ঘেঁটুদেবতা। পাতায় পাতায় সভাপতি, পাঁচজন সহ সভাপতি, তেষট্টি জন পৃষ্ঠপোষক, বিয়াল্লিশ জন পরামর্শদাতা আর অসংখ্য পদস্থ কর্মী, আঠারোটা বিভাগীয় সম্পাদক এবং কয়েকশো চাঁদা দাতার নাম ছাপানো রয়েছে। তারই একদিকে আমাদের পীতু ওরফে পীতাম্বর পতিতুণ্ডির কবিপ্রতিভার সাক্ষর নিয়ে একটা কবিতা ছাপা হয়েছে।

পীতু বলে পড়ে ছ্যাখ, একেবারে আধুনিক কবিতা—এবার নোতুন কয়েকটা কবিতা লিখেছি।

হোঁৎকাবাবু! —কুলপিওয়ালা তাড়া দেয়—দামটা বাবু? আমরা সকলেই নির্বাক মৌনী মহারাজ হয়ে গেছি। লোকটা এইবার বরফ ঠাণ্ডা গলায় গোবী মরুভূমির উত্তাপ এনে শোনায়—বাবু দামটা?

হোঁৎকা সামনে পীতুকে দেখে বলে,

—খুব তো কবি হয়ে গেলি, খাওয়া এবার। দে, ওর দামটা দে।

পীতুর পকেট থেকে ওই ঘেঁটুপূজোর ক্লাবেও বেশ কিছু গেছে। তবু খুশীতে সে ডগমগ। ওর কাছে পয়সার কোন দামই আজ নেই।

পকেট থেকে টাকা বের করে এগিয়ে দিতে দেখে কেষ্টমামা বলে—আর একখান তালে দাও কত্তা।

নিজেই বলে চলেছে সে—পীতুরেও লইয়া চল হোঁৎকা। সুন্দরবনের দৃশ্য দেইখ্যা পীতু দুই চারখান্ কবিতাও লেখ্‌বো। আমিই হেবার লিখছিলাম ওই দৃশ্য দেইখ্যা।

পীতু যেন স্বপ্ন দেখছে, তালে আমিও যাবো কেষ্টমামা।

তার কবি হবার সাধটা তেড়ে উঠেছে। হোঁৎকা বলে—এর নাম সুন্দরবন, যেমন নদী গাং আর তেমনি বন, জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।

পীতু বলে—তবু প্রকৃতিকে দেখতে যাবো হোঁৎকা, আমাকে দেখতে দে।

কেষ্টমামা যেন দল ভারি করতে চায়। তাছাড়া পীতুর বাবার বেশ চালু ব্যবসা। শাঁসালো পার্টিকে সে হাতে রাখতে চায়। তাই বলে কেষ্টমামা —সৎ ইচ্ছায় বাধা দেওনের কাম নাই হোঁৎকা, ওরে লইয়া যাবি। কবি মানুষ—সুন্দরবনে যাইব না? তোগোর রবীন্দ্রনাথও গেছলেন ওস্থানে, বুঝছস?

পীতু ভাবের ঘোরে কেষ্টমামার পায়ের ধুলো নিয়ে বসে।

কেষ্টমামা শালপাতায় আধখাওয়া কুলপি সমেত হাত উঠিয়ে বলে— কবিত্বলাভ হউক পীতু। দিগ্বিজয়ী হও। তা কুল্‌পিখান্ বানাইছ মন্দ লয় কত্তা, আর একখান্ দাও।

পীতু সায় দেয়—হ্যাঁ, হ্যাঁ দাও।

আমাদের দিকে ফিরেও চাইল না পীতে। সুন্দরবন যাবার জন্য এখন কেষ্টমামার পদসেবা করতেও রাজী আছে।

দমকা এতগুলো পয়সা খরচ করে বসলো।

হোঁৎকা ওরফে পল্লবকুমারও কবিতা লিখেছে। স্কুলের পরীক্ষার খাতায় একবার কবিতা লিখে দিয়ে এসেছিল। আর বাংলাতে হোঁৎকাচন্দর এমনিই পণ্ডিত, কবি তো বটেই শিল্পী।

সেবার পরীক্ষায় মতিলালবাবু প্রশ্ন করেছিলেন বিভূতিবাবুর অপুর পাঠশালা থেকে। প্রশ্নটা হচ্ছে অপুর পাঠশালার একটি চিত্র অঙ্কন কর।

আমার আবার বানান ভুলের রোগ ভয়ানক। বেশী লিখতে গেলেই এটা সেটা মিলিয়ে বানান ভুলের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাই সাবধানে কয়েক লাইন লিখছিলাম। প্রশ্নও পড়েছিল, বেশ কটমট প্রশ্ন।

হলের বাইরে এসে হোঁৎকা বলে—সব কোশ্চেন রাইট করে লিখেছি। আর অপুর পাঠশালার চিত্রে ফুল নম্বর হয়তো পাবো না মানে একটা মিস্‌টেক হয়ে গেছে। পণ্ডিমশাইএর লাঠিটাই দিই নি।

কয়েকদিন পর এর মর্মার্থ বুঝেছিলাম। স্বয়ং মতিলালবাবু ক্লাশে হোঁৎকার এনসার পেপারটা এনে হাঁক পাড়েন।

—হোঁৎকা, স্ট্যাণ্ডআপ্।

হাতে লকলকে বেত মতিলালবাবুর সেটা নাচাতে নাচাতে খাতাখানা ওর সামনে ফেলে বলেন—বাংলা বুঝিস্ না ? এই 'এ্যানসার হয়েছে' এটা ! রসিকতা !

চিত্র অঙ্কন কর। এ্যাঁ—শিল্পী কিনা খাতার পাতায় চিত্র অঙ্কন করেছেন অপুর পাঠশালার।

অর্থাৎ হোঁৎকা একটা পাঠশালার ছবিই এঁকে দিয়ে এসেছে, কেবল পণ্ডিতমশাই-এর হাতে বেতটাই দিতে ভুলে গেছে। আর এখন সেটা ওই মতিলালবাবুর হাতেই রয়েছে।

ঘা কতক বেশ পিটুনি দিয়েছিলেন মতিলালবাবু হোঁৎকাকে। কবিত্বের জন্য গোল্লা আর শিল্পী হবার জন্য বেত্রাঘাত, এসব জুটে যাওয়ার ফলে হোঁৎকা এমহলে পরিচিত। কিন্তু ওই পীতে কিনা ঘেঁটুপূজোর কবি হয়ে গেল।

হোঁৎকা খুব খুশী হয়নি।

তবু বলে—চল সোঁদরবন, তারপর কাব্যিটাব্যি দেখা যাবে।

আমি জানাই কেষ্টমামার এই পার্সিয়ালিটি ? এটার কথা বল ?

হোঁৎকা বলে, তাও দেখবো। ওই কেষ্টমামার হাড়ির হাল কেমন হবে দেখবি। চলতো ওখানে।

মনের মধ্যে এত গোলমাল থাকা সত্ত্বেও আমাদের যাবার আয়োজনও ঠিকঠাক হয়ে গেল। একদিন সময় দেখে রীতিমত কপালে দই-এর ফোঁটা পকেটে পূজোর ফুলটুল নিয়ে আমরা শ্যামবাজারের খালধার থেকে বাসে উঠলাম। কেষ্টমামা বাসস্ট্যাণ্ডে এসে যেন লাটসাহেব বনে গেছে।

আমাকে হুকুম করে—বাদাম ভাজা—লজেন্স টজেন্স লইয়া লও অনেকক্ষণ বাসে থাকনের লাগবো।

পটলা এর মধ্যে কেষ্টমামার মালপত্রও ছাদে তুলে দিয়ে ভিতরে একটা সিট রেখে দিয়েছে। হোঁৎকাকে হুকুম করে কেষ্টমামা—হোঁৎকা তুই বাজারের ফর্দ কইরা ফ্যাল।

আর টাকা-পয়সা যার যা আছে সাবধানে রাখবা। নয়তো আমারেও

দিতে পারো। মানে জায়গা ভালো না। হোঁৎকা পয়সা-কড়ির নাম শুনে গুম্ খেয়ে যায়।

কেষ্টমামাকে আমিও চিনি। নিজের গাঁটের টাকা দিয়ে ঠকতে রাজী নই।

আমাদের উতিইতি ভাব দেখে কেষ্টমামা বলে—রাখ তোগোর কাছেই রাখ। খরচটা যা হইব পটলারে দিবি। ওরেই দলের ম্যানেজার করছি।

বুঝলাম পটলা এন্তার তেল দিয়েছে কেষ্টমামাকে। পটলা বলে—আমি হতে চা....চাইনি। ম মানে—কেষ্টমাম-মা। কেষ্টমামা ওর ওই জিব আটকানোর কষ্ট থেকে ওকে উদ্ধার করার জন্য বলে—আমি ওরে করলাম। হিসাব রাখনের লাগবো। তোগোর তো যোগবিয়োগ আসে না। বস গাড়ি ছাড়বো।

এ গাড়ি থেকে নেমে আবার বসিরহাটে অন্য একটা ধ্যাড়ধ্যেড়ে বাসে উঠতে হবে। সেটায় বেশ কিছু পথ গেলে আমরা পোঁছবো কালীনগরের গঞ্জে। সেখানেই কেষ্টমামার দাদাদের দোকানপাট। সেখান থেকে বনযাত্রা শুরু হবে। বসিরহাট অবধি কোনরকমে এসে নামলাম।

বেলা হয়ে গেছে। রোদও চড়্‌চড়্ করছে, আর খিদেও লেগেছে তেমনি। এতক্ষণ ধরে কেষ্টমামা বলে এসেছে।

—এই তো পথ। বসিরহাট গেলেই দেখবি এ শম্মার খাতির খান। হক্কলেই চেনে, আর কালীলগরে দেখবি মাটিতে পাও দিবার লাগবো না। তোগোর কুলেপাড়ার একখান্ ঘরে থাকি বটে—এখানে রাজা লোক এই কেষ্ট সরখেল।

বসিরহাটে নেমে তাই বলি।

—খিদেতে নাড়ি জ্বলে যাচ্ছে কেষ্টমামা।

কেষ্টমামার ম্যানেজার পটলকে এর মধ্যে কিছু কিছু করে টাকা জমা দিয়ে রেখেছি। কেষ্টমামা আমার কথায় বলে—

—ক্ষুধা লাগছে? পটলা—

পটল ওর ইশারায় কোথায় চলে গেল তখুনিই। আমরা রাস্তার ধারে

মালপত্র আগলে দাঁড়িয়ে আছি। ওদিকের খাবারের দোকানে বড় বড় কড়াতে সাজানো কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, দানাদার, চমচম নানা কিছু। জিবে-জল আসে।

কেষ্টমামা বলে—পথেঘাটে ওইসব খাদ্য বিষ ; খাইতে নাই। ভিটামিন খাবি। বুঝছস।

খিদেতে তখন পেট জ্বলছে, তাই বলি—

—ইট পাটকেলও খেতে পারি এখন কেষ্টমামা।

হোঁৎকা গজগজ করে, কখন চাট্টি ভাত খেয়েছি, বাসের ধকলে সব হজম হয়ে গেছে।

এমন সময় পটল এসে পড়েছে। ওর হাতে ঠোঙাও নেই, খাবার-দাবারও নেই। ও এনেছে বিরাট সাইজের কয়েকটা লাল মুলো শাকপাতা সমেত।

চমকে উঠি। কেষ্টমামা বলে—খাইয়া ল হোঁৎকা, ভিটামিন এ হইতে জেড্ অবধি এর মধ্যে পাইবি। আয়রন ক্যালসিয়াম—

—ছাইপাঁশ কি এনেছিস পটলা? হোঁৎকা গর্জে ওঠে, ওই খেতে হবে? আমরা কি গরু না ছাগল?

বিরক্ত হয়ে বলে উঠি—বলদ।

কেষ্টমামার ইশারায় পটল হাট থেকে আটআনা পয়সায় ওই বিরাট মুলো এনেছে। লাঞ্চ টিফিন সব সারা হবে ওতেই। এমন সময় কোত্থেকে একটা বিরাট কালো রং-এর এঁড়ে গরু এসে পটলার বগলের মুলোর বাণ্ডিল ধরে ফোঁস করে এক টান দিতে সব মুলোগুলো শালপাতা সমেত সোজা ওর হাত থেকে চলে গিয়ে ওই এঁড়ে গরুর মুখ থেকে ঝুলতে থাকে।

মাল হাতছাড়া হতে দেখে কেষ্টমামা চীৎকার করে।

—ধর। ধর পটলা, মুলোগুলান ধর।

এঁড়ে গরুর কাছে এগোয় কোনজন? ব্যাটা তখন শিং উঁচিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে—ফোঁওস্।

আর কচকচ করে মুলো চিবিয়ে চলেছে। পটলা বলে—ম্ মারতে আসে যে—

কেষ্টমামা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হুকুম করে—হোঁৎকা, সুন্দরবনের রয়েলবেঙ্গল টাইগার দেখতে যাবি, ওই গরুটারে রুখতে পারস না? ফাইট—

হোঁৎকা আর আমি দেখছি মুলোগুলো তবু ওর ভোজে লাগুক।

হোঁৎকা বলে—তুমি একটু এসো কেষ্টমামা।

এমনসময় ধুলো উড়িয়ে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে বাসটা আসছে। ওই বাসেই আমাদের উঠতে হবে। বাসের ইঞ্জিন থেকে রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মত স্টিম বের হচ্ছে।

আমি শুধোই—চড়বো কোনখানে, অ কেষ্টমামা?

তিলধারণের জায়গা নেই কোথাও। ভিড় আর ভিড়। এর মধ্যে কনডাকটার আর বাসের গায়ে দোদুল্যমান একটা সিড়িংএ মত ছেলে আমাদের মালপত্র টপাটপ করে লোফালুফি করে ছাদে তুলেছে।

কেষ্টমামা জানায়—ঝুইলা পড়। যা পাস হাতের কাছে তাই ধইরা ঝুইলা পড় দুগ্‌গা বলে।

বাস ছাড়ছে। মালপত্রের দিকেই যেন তাদের বেশী নজর। তাই সেগুলো কপাকপ তুলে নিয়েই বাসটা চলতে শুরু হয়েছে।

হোঁৎকা ওদিকের ইঞ্জিনের পাশে উঠেছে। কেষ্টমামা লিকলিকে, সে সুরুৎ করে ভেতরে সেঁদিয়ে গেছে আর পটলা আগেই ছাদে উঠে গেছে।

আমি কোথায় উঠবো জানি না। গাড়িটা গড়গড়িয়ে চলছে আমাকে ফেলে রেখে। সুন্দরবন দর্শন হবে না। মরীয়া হয়ে ছুটতে থাকি বাসের পাশে পাশে। উঠতেই হবে যেভাবে হোক।

হঠাৎ হাতের কাছে কি খানিকটা আসতে দেখে তাই কপ্‌ করে ধরে বাসে উঠেছি। গাড়ি চলছে আর পরিত্রাহি ডাকও কানে আসে।

আমিও চোখ বুজে আমার অবলম্বনকে কসে ধরে আধা ঝুলন্ত অবস্থায় চলেছি। গাড়ি থেমে যায়।

কনডাকটার প্রায় ঘায়েল হয়ে গেছে। আর সেটা ঘটেছে আমার জন্যই। আমি মরীয়া হয়ে ওর লম্বা দাড়ির একখামচা ধরে ঝুলে পড়েছিলাম। আমার ওজনেই আর দাড়ির টানে ওই দশাসই মর্দ এখন

টানটান হয়ে চিঁচিঁ করছে।

বাসের যাত্রীরা এই মারে তো সেই মারে। আমিও জানাই—ছাড়লেই ছিটকে পড়তাম যে!

রাস্তার ধারে জলও তেমন নেই। সেই কনডাকটারের যোগানদার ছোঁড়াটা দৌড়ে গিয়ে কাদা ভর্তি জল বালতি করে এনে কনডাকটারের মাথায় মুখে দিতে থাকে।

কাদাগুলো ওই দাড়িতে লেগে লেবড়ে গেছে, আর জলের সঙ্গে উঠে এসেছে গাদাখানেক ব্যাং পোনা, সেগুলোও তিড়িক্ তিড়িক্ করে দাপাচ্ছে ওর দাড়ি জামা সারা গা-ময়।

কোনরকমে ওই কনডাকটারকে তুলে যাত্রী বানিয়ে আমরা চলতে শুরু করলাম। তার আর টিকিট কাটার সাধ্যি নেই। গালটা সন্থ ছিঁড়ে তোলা দূর্বাঘাসের চাবড়া ওঠার মত এবড়ো-খেবড়ো হয়ে গেছে।

শেষকালে গাড়ি এসে থামল কালীনগরের হাটতলায়। আমরাও মালপত্র নিয়ে সাততাড়াতাড়ি হাওয়া কাটলাম। কারণ ততক্ষণে ওই কনডাকটারের কাহিল অবস্থা দেখে ওর বেরাদার-এর দল জুটে গেছে।

অনেকেই অবাক হয়ে শুধায়—ই ক্যায়সে হুয়া?

এসব খবর যদি ওরা জেনে ফেলে আমাদেরও অমনি অবস্থা হতে পারে তাই সটান সরে পড়লাম।

কোথায় যাচ্ছি, কোনদিকে যাচ্ছি জানি না।

বেশ কিছুটা এসে গাংএর ধারে দাঁড়ালাম। এখানটায় বোধহয় ধান-চালের ভালো ব্যবসা হয়। বেশ চওড়া নদী—ঘাটে অনেক নৌকা বাঁধা। এদিকে সারবন্দী টিনের চালায় দোকানপত্র রয়েছে।

আজ হাটবার নয়, তাই তত ভিড় নেই।

একটা অশ্বত্থগাছের নীচে বসলাম। রোদ পড়ে আসছে তবু রোদের তাপ কিছুটা রয়েছে। সামনের টিউবওয়েলে আকণ্ঠ জল খেয়ে একটু ধাতস্থ হলাম।

হোঁৎকা বলে ওঠে—কই গো কেষ্টমামা, এখানের রাজা গজা লোক তোমরা, তা রাজপ্রাসাদটা কোনদিকে বলো দিকি এইবার? রাজভোগ

না হোক ভাত রুটি কিছু ছাখো এইবার। আর পটলা ফের যদি মুলো এনেছিস তোকে গাংএর জলে ছুঁড়ে ফেলে দোব মুলো সমেত।

পটলা বলবার চেষ্টা করে—ম্-মামা যে বললো আনতে—

কেষ্টমামা এবার আশ্বাস দেয়।

—তরা বস, চা-টা খাইয়া ল। আমি দাদার খোঁজ কইরা আসি। আর কোনো ভয় ডর নাই। কেউ কিছু কইলে কবি কিষ্টোর দাদা রাধিকার কাছে যামু—আমি যাইতেছি। কেষ্টমামা চলে গেল।

হোঁৎকা শুধোয়—কেষ্টোর দাদা রাধিকা কি বলেরে?

পটলা জানায়—ওদের হয়।

এবার একটা আস্তানা মিলবে। আশ্রয় পাবো—বাসে আসতে ঝাঁকানি আর এই ঝুলোঝুলিতে বেশ নাজেহাল হয়ে পড়েছি। এবার একটু আরাম করে কাল সুন্দরবনে যেতে পারবো।

ওই বিস্তৃত নদীর দিকে চেয়ে থাকি।

ঘাটে নৌকার মাঝিদের চিৎকার শোনা যায়।

—সন্দেশখালি—রামপুর—দুর্গাতলি যাবে এ-এ-এ—

ওরা ভাড়ায় যাতায়াত করে। গাংএর ধারে বসে ওই লোকজনদের দিকে চেয়ে থাকি।

পটলা বলে—ক্ কেষ্টমামা কাজের লোক। স-সব ব্যবস্থা প-পাকা করে আসবে।

কেষ্টমামার তখনও দেখা নেই। আমরা চারটি প্রাণী তখনও বসে আছি নদীর ধারে অশ্বত্থ গাছের ছায়ায়। পটলা বলে—খিদে পেয়েছে র‍্যা?

হোঁৎকা ওদিকে দোকান থেকে কিছু মুড়ি আর কলাইভাজা এনে চিবুচ্ছে। আমাকেও ভাগ দিয়েছে। পটলা বলে—

—ক-কই দে মুড়ি?

হোঁৎকা বলে ওঠে—রাঙ্গামুলো কিনে আন? কেষ্টমামা কোথায়? ছাখ সটকালো কিনা।

পটলা ঘাবড়ে যায়—আমার ট্…টাকা পয়সা যে ওর কাছেই রে।

—তবে আর কি? গাংএর জল খা।

এমন সময় দেখা যায় কেষ্টমামা ফিরছে বাঁধের পথ ধরে। মুখটা শুকনো। হতাশ হয়ে জানায় সে—সব্বোনাশ হয়ে গেছে হোঁৎকা। দাদা নেই।

আমি তো চমকে উঠলাম—নেই মানে কি গো? পটল তুলেছে নাকি? অর্থাৎ কাবার হয়ে গেছে বোধ হয় লোকটা।

কেষ্টমামা বলে—না-না। ওরাও সব সুন্দরবনে গেছে। ধানচাল-এর কারবারী। কাঠের মহাজন কিনা তাই যেতে হয়।

পটলা বলে ওঠে—তাহলে! স্-সুন্দর ব....বন যাবো না?

কেষ্টমামা এবার অভয় দেয়—আমি যখন রয়েছি তখন যাওয়া হবে না এডা একটা কথা! বনে গিয়েই ধরবো ওগোর। বিরাট নৌকো হেখানেই থাকনের খাওনের ব্যবস্থা হইব। শুধু এইটুকু পথ দু গোনেই চলে যাবো একটা নৌকা ভাড়া কইরা লই।

হোঁৎকা বলে ওঠে—তাই চল। এদিককার সব তো ফুসফাস হয়ে গেল। তাই বলে এত কাছে এসে সুন্দরবন যাবো না এ কি হয়?

পীতাম্বর এতক্ষণ চুপচাপই ছিল। ওপাশে গাং-এর ধারে বসে একটা মোটা খাতায় বোধহয় কবিতা লিখছিল। সেও সায় দেয়—ঠিক কথা হোঁৎকা, ফিরে যাবো না এত কাছে এসে।

তারপরই গলা তুলে ও শুরু করে—

হে সুন্দরী অরণ্য
তোমায় হেরিব বলি
এতকোশ পথ আমি এসেছি চলিয়া।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—থামবি পীতে! এদিকে আমরা ভাবছি আমাদের কথা, উনি এলেন কাব্যি করতে। মারবো এ্যাক রদ্দা!

পীতু চুপ করে গেল।

হোঁৎকা বলে—ছাড় দিকি কিছু টাকা, নৌকা ঠিক করতে হবে।

পীতু শাঁসালো মক্কেল। টাকাটা সেই এগিয়ে দেয়।

কেষ্টমামা খুশী হয়ে বলে—এরেই কয় দেশভ্রমণ—নৌকা ভ্রমণ। সব ব্যবস্থা কইরা আসতিছি। দেহি ট্যাকাটা—

হোঁৎকা এইবার চটে উঠেছে। ও বলে—না, আমিই ব্যবস্থা করছি।

কেষ্টমামা মুখ বোদা করে রইল। আমরাই এবার সব ব্যবস্থা করছি কেষ্টমামা তাতে খুশী হয়নি এটা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। তবু গজগজ করে—হব কিছুই কেননের লাগবো। ফর্দটর্দ ঠিকমত করবা।

তারপর বলে—চল কষ্ট কইরা এইটুন পথ, বনে ওগোর ক্যাম্পে যাইয়া উঠুম। দেখবি ক্যামন বন্দোবস্ত।

হোঁৎকা বলে—বাঘটাঘ দেখতে পাবো তো ?

নৌকার মাঝি আর দুজন দাঁড়ি। আমরা এবার বনের দিকে চলেছি। নৌকাতেই তোলা উনুনে রান্না হচ্ছে। খিচুড়ি আর হাট থেকে কেনা মাছ, তাই ভাজা হচ্ছে।

তারাগুলো জ্বলছে। রাতের অন্ধকারে গাংএর থির জলে তারাগুলো ঝিকিমিকি তোলে। আমরা ক'জন চলেছি।

মাঝি বলে—বাদাবন বাবু! সাংঘাতিক জায়গা।

কেষ্টমামা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। মাঝির কথায় সে এইবার সর্দারী দেখাবার জন্য বলে—বাদাবনের কথা আমারে ত শোনাইও না মাঝি ! আমি কতোবার গেছি সেহানে। বাঘ হরিণ এসব তো মারছিই।

মাঝি চুপ করে থাকে ওর কথায়।

পটলা বলে—এবার কিছু একটা মারতে হবে মামা। হ-হরিণের মাংস নাকি খু-খুব ভালো ?

আমাদেরও ওই সাধ আছে। কেষ্টমামা অভয় দেয়।

—খাওয়াইমু। তোগোর খাওয়াইমু হরিণের মাংস।

ওই হরিণের মাংস মনে করেই কোনরকমে খিচুড়ি আর মাছভাজা দিয়ে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম ছইএর মধ্যে।

মাঝি বলে—রাত ভোর বাইতে হবে বাবু, আপনারাও একটু সজাগ হয়ে থাকুন। জায়গাটা ভালো নয়।

সুন্দরবনের আবাদ অঞ্চল, এর কিছু দূরেই শুরু হয়েছে সুন্দরবনের সীমানা, নদীরও তেমনি বিস্তার। ধারে কাছে লোকবসতিও কমে আসছে, তাই এ অঞ্চলে মাঝে মাঝে নৌকায় ডাকাতিও হয়।

পীতু চমকে ওঠে—এ যে ডাকাতির কথা বলে রে ?

হোঁৎকা বলে—ডাকাতরা কি নেবে বাবা? আসুক না।

আমিও জানি সঙ্গে তেমন কিছু নেই। তবু ভয় হয় ডাকাতের নাম শুনে। সেবার আমাদের গাঁয়ে কবরেজদের বাড়িতে ডাকাত পড়েছিল, কিন্তু ডাকাতের দল ভুল করে অন্য বাড়িতে ঢুকেছিল। সেখানে কিছু না পেয়ে বাড়ির লোকজনদেরই পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে গিয়েছিল, তাই বলি—

—ওটা তো ভয়ের কথা রে? যদি কিছু না পায়, মজুরি না পেলেই বেদম মার দেবে তা জানিস?

কেষ্টমামাও ভাবছে—ঠিক কইছস্।

ঘুম আসে না। নৌকাটা চলেছে, দাঁড়ের শব্দ ওঠে—ঝপ্ ঝপ্। দুলছে নৌকাটা। সেই দোলানিতে ঘুম এসে যায়। সারাদিন ধকল গেছে, গা হাত-পা টাটিয়ে ছিল তাই চোখ বুজে আসতে দেরী হয় না।

হঠাৎ কাদের চীৎকারে ঘুম ভেঙে যায়। নৌকা দুলছে! কারা যেন হাঁক পাড়ে—চেল্লাবি না। চীৎকার করলে কোন বাপ্ তোদের বাঁচাতে আসবে না। গাং-এর জলে লাথি মেরে ফেলে দোব। কামটে শেষ করে দেবে।

কামটের নাম শুনে শিউরে উঠি।

জলে থাকে দেখতে বড় মাছের মত। ঝাঁক বেঁধে ওই জীবগুলো জলে ঘুরে বেড়ায়। ওদের মুখে থাকে থাকে সাজানো খুরের মত ধারালো ঝকঝকে দাঁত। মানুষ পেলে তার হাত পা খুবলে মাংস তুলে নেয়।

আর সেই কাটা ঘা বিষিয়ে গিয়ে মানুষ মরে যায়। বাঁচানো যায় না। এসব নোনা জলের গাং-এর জল মানুষে তাই ছোঁয় না।

ওরা আমাদের ওই কামটের মুখ ফেলে দেবে।

—কি আছে বের কর! এ্যাই—

হোঁৎকার বিশাল শরীর দেখে ডাকাতগুলো ওর দিকেই বেশী নজর দিয়েছে। কে এর মধ্যে ওকে বেঁধে ফেলেছে।

হোঁৎকা বলে—যা আছে নিয়ে যাও।

ঠা ঠা করে হেসে ওঠে কালো মুষকো মত লোকটা। ও দেখছে নৌকার ছই এর মধ্যে আমাদের সাজানো জিনিসগুলোকে।

তাই দেখে অবজ্ঞা ভরে বলে ওঠে—কি আছে যে নোব তোদের-? বুঝলি কালাচাঁদ সর্দার মশা মেরে হাত কালো করে না।

কেষ্টমামা ওপাশে দাঁড়িয়েছিল, সে বলে—

—তবে আইলা ক্যান? আমার দাদার নাম শোননি—রাধিকা—ও ওক্—

কে ওর গালে সপাটে এক চড় কসেছে। কেষ্টমামা গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে। ডাকাতদের একজন বলে।

—চ্যাংড়ার দল কোথায় চলেছিস? এ্যাই জবাব দে—

আমি কোনমতে জানাই।

—সুন্দরবন দেখতে যাচ্ছি। কলকাতায় থাকি আমরা।

কালাচাঁদ সর্দার হেসে ওঠে।

—বাঃ! বেশতো সাহস তোদের? কলকাতার লোক বাদাবনের নাম শুনিস নি? সুন্দরবন দেখতে এসেছিস?

পীতু বলে—আমি কবিতা লিখি, তাই ভাবলাম।

চোপ ব্যাটা কবিয়াল! এক থাপ্পড়ে কবিয়ালের বাপের নাম খগেন করে দোব।

ওদিকে ডাকাতের দলের লোকজন আমাদের এই দশা দেখে হাসছে।

কেষ্টমামা চিঁ চিঁ করছে, জল। একটু জল।

—এ্যাই, কালাচাঁদ ধমকে ওঠে—দেতো গুপে ব্যাটার মুখে ইয়ে করে। এক চড়েই বলে কিনা জল খাবো।

কেষ্টমামা জানায়—না না। জল খামু না।

হোঁৎকাকে ওরা বেঁধে রেখেছে, বাকী আমাদের কোন পাত্তাই দিতে চায় না। আমরা যেন ওদের কাছে চামচিকে। আমাদের আমল দেবার কোনো দরকারই বোধ করেনি ওরা।

পটলার এতক্ষণ বাক্য বন্ধ হয়ে গেছল। কালাচাঁদ সর্দার ধমকে ওঠে ওকে—এ্যাই! তোর নাম কি?

পটল কাঁপছে ওদের সামনে। জবাব দেবার সাধ্য তার নেই। জিবটা আলটাকরার সঙ্গে সেঁটে গেছে। কোনমতে সে জবাব দেবার চেষ্টা করে।

—প প, প,........

—এ্যাই জবাব দে, প প, করিস না। পটলার পেটেই একটা গোঁত্তা মেরেছে লোকটা আর সেই সঙ্গে বাকী কথাটা ফস্‌কে বের হয়ে যায়—

টলা—

ওরা হেসে গড়িয়ে পড়ে এ ওর গায়ে........

—গাল দিচ্ছে নাকি রে? কালাচাঁদ সর্দার শুধালো।

তাই আমিই বলে উঠি—ও তোৎলা কিনা।

—চোপ! ওরা পটলাকে নিয়ে পড়েছে—বাপের নাম বল।

পটলা পিন আটকানো ফাটা রেকর্ডের মত আওড়ে চলেছে একতালে।

—গু-গু-গু-গু—

ওর বাবার নাম গুপীনাথবাবু, সেটা পুরো আর বের হয় না তার মুখ দিয়ে, জিবটা আবার বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

আর ওই কালো কালো মানুষগুলো হাসছে। অন্ধকারে ওদের প্রেতের দলের মত বোধ হয়।

কালাচাঁদ সর্দার বলে—ধ্যাৎ, কোথায় এসেছিলি তোরা। চল—

এগুলোর কি করবো? দলের একজন শুধোলো।

অন্যজন বলে—এ জানোয়ারগুলোকে গাং-এ ফেলে দিয়ে নৌকাটা নিয়ে চলে যাই, কাজে লাগবে।

চমকে উঠি ওদের কথায়। এই অকূল গাং-এ ফেলে দিলে আর বাঁচতে হবে না। ডুবে মরবো, না হয় কুমীর কামটের পেটেই যেতে হবে। হঠাৎ কেষ্টমামা চীৎকার করে উঠে কালাচাঁদ সর্দারের গায়ের উপর আছড়ে পড়ে।

—আমারে মাইরো না সর্দার। ওগোর যা হয় করো—আমারে ছাইড়া দাও। বাদাবনে আর আস্‌মু না।

—চোপ!

কেষ্টমামা নিজে বাঁচাবার জন্য সবকিছু করতে চায়।

কালাচাঁদ সর্দার বলে ওঠে—ব্যাটাদের বাদাবনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দোব।

চল, নৌকাটা ছিপের সঙ্গে বেঁধে নে দিকি। টেনে নিয়ে চল ব্যাটাদের, তারপর দেখা যাবে।

রাত কতো জানিনা। আমরা নৌকার ছই-এর মধ্যে রয়ে গেছি। বের হবার সাহস নেই। আমাদের নৌকার মাঝি আর দাঁড়িদের ওরা বেঁধে রেখে গেছে।

নৌকাটার গতি এবার বেড়ে গেছে বনবনিয়ে। ওই ডাকাতের দলের ছিপের পিছনে লম্বা রশি দিয়ে আমাদের নৌকাটা বাঁধা অবস্থায় চলেছে।

ওরা আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে সুন্দরবনের দিকে, বোধহয় সেখানে নিয়ে গিয়েই আমাদের মেরে ফেলবে আর বনে ফেলে দেবে। কেউ আমাদের হদিস, কোন খবরই জানতে পারবে না। অন্ধকারে ক'টি প্রাণী চুপ করে বসে আছি।

সুন্দরবন দেখার সাধ মিটে গেছে। এখন কি করে প্রাণে বাঁচবো তাই ভাবছি।

এমনি ডাকাতের হাতে পড়বো ভাবিনি কখনও।

কেষ্টমামা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। এবার ওর চিঁচিঁ গলার শব্দ শুনতে পাই, ও বলে—ব্যাটারা গেছে গিয়া ?

আমি বিরক্ত হয়ে উঠেছি কেষ্টমামার উপর। লোকটা কেবলই ধাপ্পার পর ধাপ্পা দিয়ে আসছে। ওর কথায় জানাই—গেল আর কোথায়, আমাদের জিয়োনো কই মাছের মত টেনে নিয়ে চলেছে। এবার নিয়ে চলেছে শেষ করে দেবে।

পীতু বলে—এমন জানলে আসতাম না।

পটলার বাক্ বন্ধ হয়ে গেছিল, সে এবার বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে বলে—ম···মারবে ?····

হোঁৎকা বাঁধা অবস্থাতেই বসে আছে, সে রাগে জ্বলছিল। পটলার কথায় বলে ওঠে—না। জামাই আদরে তোয়াজ করে রাখবে তোদের। ভূতের দল। বাঁধনটা খোল আমার।

এতক্ষণে সেটা যে করার দরকার, সেই খেয়াল হয়। অন্ধকারে হাতড়াচ্ছি, একটা ছুরি ছিল ব্যাগে। কিন্তু ডাকাতের দল এখানে ঢুকে

আমাদের জিনিসপত্রও তছনছ করে গেছে লাথি মেরে।

বাইরে মাঝিদেরও বেঁধে পাটাতনে ফেলে রেখে গেছে।....আর নৌকাটাকে টেনে নিয়ে চলেছে তারা, কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে!

অন্ধকারে ওদিকে হঠাৎ ব্যাগটা হাতে পাই, হাতড়ে বড় ছুরিটা বের করে হোঁৎকার বাঁধন খোলার জন্য এগিয়ে যাই।

কেষ্টমামা বলে ওঠে—ওগোর বাঁধন খুলছস, যদি ওরা জানতে পারে একটারেও রাখবে না আমাগোর।

কেষ্টমামা যে এমনি তা জেনেছি, তাই বলি—চুপ করে থাকো তুমি।

কেষ্টমামার কথায় পটলা সমর্থন করে, ওটা কি ঠিক হবে?

আমি জানি হোঁৎকাই তবু একটা বুদ্ধি বের করতে পারে। ওকে মুক্ত করা দরকার।

হোঁৎকা গজরাচ্ছে—ওগুলোর সঙ্গে মানুষ কোথাও আসে।

আমি ছুরি দিয়ে ওর বাঁধনগুলো কেটে দিতে থাকি। ওকে খুললেও ডাকাতগুলো আমাদের মারবে, না খুললেও মারবে। তবু বাঁচার একটু চেষ্টা করতেই হবে।

রাত কত জানিনা। বোধহয় ভোর হয়ে আসছে। চারিদিকে ঘন কুয়াশা। সাদা পুরু জমাট একটা পর্দা যেন সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে। দশহাত দূরেও নজর চলে না। হোঁৎকা ছাড়া পেয়ে চুপিচুপি বাইরে এসে দেখতে থাকে গুড়ি মেরে, কিছুই দেখা যায় না। কোথায় চলেছি কোথায় আছি তাও জানি না। আমাদের নৌকার মাঝিরা বাঁধা অবস্থাতে পড়ে আছে নৌকার পাটাতনে। দু' একজনকে ডাকাতরা মারধোরও করেছে।

হোঁৎকা ওদের বাঁধনগুলো খুলে দিতে ওরা উঠে বসল। ওদের চোখে মুখেও ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

—কোথায় চলেছি মাঝি?

মাঝি এ অঞ্চলের লোক, কিছুই নজর চলে না। তবু অনুমানে ভর করে সে বলে—সুন্দরবনে এসে গেছি বাবু।

নৌকাটা বেশ বেগেই চলেছে। দূরের ডাকাতের ছিপটাকে দেখা যায় না। লম্বা দড়ি দিয়ে ওদের ছিপের সঙ্গে আমাদের নৌকাটা বাঁধা রয়েছে।

তারই টানে চলেছে নৌকাটা।

মাঝিটা বলে—বাবু নৌকাটা কেড়ে নেবে আমাদের। গরীব মানুষ—নৌকা বেয়েই ওরা খায়, সংসার চালায়। ওইটা তাদের কাছে প্রাণের চেয়েও বেশী দামী। বেশ জেনেছে মাঝিরা ওই ডাকাতের দল তাদের নৌকাটা কেড়ে নেবে। প্রাণে বেঁচে থাকলেও নৌকা হারানো তাদের কাছে মরার চেয়েও বেশী।

কুয়াশার সাদা পর্দাটার আড়ালে কিছুই দেখা যায় না। হোঁৎকা কি ভাবছে, ওর মাথায় যেন একটা কিছু ফন্দী এসে গেছে। পটলা বলে—ব্‌....ব্যাটারা ধরতে পারলে খ-তম করে দেবে।

আমি জানাই—এমনিতেও বাকী রাখবে না কিছু।

কেষ্টমামা গুড়িসুড়ি মেরে ছই-এর থেকে বের হয়ে এসেছে। ওর মুখ শুকনো চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কেষ্টমামার সেই তেজ দাপট আর নেই।

সে বলে—এহন ওগোর চটানো ঠিক হইব না।

পীতু বলে ওঠে—তালে ওদের হাতে গলাটা বাড়িয়ে দিই কি বল?

হোঁৎকা ধমকে ওঠে—কেউ কথা বলবি না, যা সব ছই-এর ভিতরে যা।

হোঁৎকা একটা কিছু করার জন্য তৈরি হয়েছে। যা করতে হবে এখুনিই করা দরকার। কুয়াশা থাকতে থাকতেই করতে হবে। নইলে কুয়াশা চলে গেলে আর কিছু করার থাকবে না।

মাঝিরাও তৈরি। তারা কিছুটা যেন বুঝতে পেরেছে কোনখানে রয়েছি। এ জঙ্গল তাদের চেনা।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি।

নৌকার রশিটা কেটে ফেলেছে হোঁৎকা। নৌকার মাঝিও নিপুণ হাতে হালে মোচড় দিয়ে চকিতের মধ্যে নৌকাখানাকে ওদিকে বনের মধ্যেকার সরু খালে ঢুকিয়ে দিয়ে কোনরকমে ওই খালের মধ্যে দিয়ে বেয়ে চলেছে আরও গভীর বনের ভিতর দিকে। একটু গিয়ে খালটা দুভাগ হয়ে গেছে।

দুদিকে গভীর বন, কুয়াশা তাদের মাথায় জমাট বেঁধে আছে। আমরা

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছি এখুনি ডাকাতের দলও টের পেয়ে যাবে যে, আমরা ওদের নৌকার বাঁধন কেটে চলে এসেছি। ওরাও শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে মরীয়া হয়ে তেড়ে আসবে এই বনের মধ্যে।

....নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ভয়ে।

শিশিরের জমা জলের বিন্দু ঝরছে পাতায়—জলের টুপ্ টাপ্ শব্দ। কোথায় একটা হরিণ কর্কশ স্বরে ডেকে উঠল।

বাঁদরের পাল কেওড়া, গরান গাছের ডালে কিচিরমিচির করছে। আমরা ছই-এর মধ্যে কোনরকমে বসে আছি।

কতক্ষণ কেটে গেল ঠিক বুঝতে পারি না। হয়তো ক্লান্তি আর ভয়ে এই নৌকার ছই-এর মধ্যেই ঘুমের ভাব এসেছিল। আমরা পালিয়ে আসতে পেরেছি ওই হিংস্র ডাকাতদের জাল কেটে।

ছই-এর মধ্যে দিনের আলো এসে পড়েছে। কুয়াশার ঘন পর্দাটা কখন সরে গিয়ে গাছ-গাছালি আর খালের জলে সকালের সোনা রোদ এসে পড়েছে।

হাজার পাখি কলরব করছে। মৌমাছির গুনগুন সুর ওঠে। আমরা জেগে উঠে সুন্দর এই বনের দিকে চেয়ে থাকি। ঘন ঠাস বুনোটভাবে গাছগুলো মাথা তুলেছে। মাঝে মাঝে বিরাট কেওড়া, গরান, বান, বুন্দুল, গর্জন গাছ মাথা তুলেছে। তাদের ডালে ডালে সবুজ পাতার রং ছাপিয়ে চন্দন রং-এর ফুল ফুটেছে।

মাঝি বলে—ধলখালির জঙ্গলে এসেছি বাবু।

আমাদের কাছে এ জঙ্গল কি অপরূপ রূপে ফুটে উঠেছে।

কেষ্টমামা বলে—দেখছস্ সুন্দরবন এরেই কয়। পটলাও সায় দেয়, ঠিক কথা।

হঠাৎ জলে ছপ্ ছপ্ শব্দ শুনে চমকে উঠি।

হোঁৎকা বলে চাপা স্বরে—ছই-এ ঢোক সবাই। শীগ্গীর।

মাঝি দুটোও ছই-এ ঢুকেছে।

মনে হয় ডাকাতের দলের লোকেরা বোধহয় টের পেয়ে গেছে যে ওদের কলা দেখিয়ে আমরা কেটে পড়েছি। তাই বুঝতে পেরে আবার খুঁজে

খুঁজে ফিরে এসেছে।

কেষ্টমামা বলে—হেঁাৎকার জন্যিই হক্কলের জানটা যাইব এবার।

হেঁাৎকাও ধারালো কাটারিখানা নিয়ে ছই-এর ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ও জানে এবার মরা ছাড়া আর পথ নেই। তবু মরার আগে সে ওদের দু' একটাকে খতম্ করে তবে মরবে।

....শব্দটা কাছে এগিয়ে আসছে।

....ছই-এর ফাঁক দিয়ে চেয়ে থাকি, হঠাৎ চমকে উঠলাম।

—হেঁাৎকা!

হেঁাৎকাও দেখেছে দৃশ্যটা। মাঝি ইশারায় চুপ করতে বলে আমাদের।

নৌকার কিছু দূরে খালের ধারে ভাঁটার জল নেমে গেছে। পলিমাটিতে লাফাচ্ছে দু' একটা ভাঙ্গন, সিলেট মাছ। আর একটা ইয়া কেঁদো হলুদ কালো ডোরাকাটা বাঘ ওই কাদার মধ্যে নেমে থাবা দিয়ে থাপ্পড় মেরে মাছগুলোকে ধরে ধরে বিরাট মুখে পুরছে।

....তারই পায়ের শব্দ উঠছে জলে।

....ডাকাতের কবল থেকে কোনমতে বেঁচে এসেছি। কিন্তু এবার সাক্ষাৎ শমনের সামনে এসে পড়েছি।

ওর হাত থেকে আর নিস্তার নেই।

বাঘটা এখুনি নৌকায় লাফ দিয়ে উঠে এসে থাবার এক ঘায়ে ছই-এর দরজা উড়িয়ে দিয়ে দু' একজনকে টেনে নিয়ে গিয়ে ব্রেকফাস্ট সারবে।

....পটলা যেন কাঠ হয়ে গেছে, আর পীতের দুচোখ কপালে উঠেছে। সে বু...বু...বু করছে কেষ্টমামাকে জড়িয়ে ধরে। অবশ্য সেই কেষ্টমামাকে ধরেছে, না কেষ্টমামাই ওকে জড়িয়ে ধরে কাবু করে ফেলেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

কেষ্টমামার মুখ থেকে ফ্যাৎ ফ্যাৎ করে একটা শব্দ বের হচ্ছে, মনে হয় ও যেন খাপ্‌ছি খাচ্ছে।

বাঘটা একবার চোখ তুলে নৌকার দিকে চাইল।

কি ভেবে ধীরে ধীরে কাদা থেকে উঠে বনের গাছগাছালির নীচে শক্ত মাটিতে গিয়ে দাঁড়াল।

মনে হয় এইবার লাফ মারবে সোজা নৌকার উপর আর আমাদের দু' একটি কলকাতার জীবকে তুলে নিয়ে আর এক লাফে ওপারে চলে যাবে।

ডাকাতের ভয় ভুলে গেছি।

এবার নিজেদের পরানের ভয়ে আমরা ক'টি প্রাণী ঠকঠকিয়ে কাঁপছি। বাঘটা কি ভেবে আর এগোলো না।

তীর থেকে দু-একবার গর্জন করে যেন আমাদের দুঃসাহসের জন্য কড়া ধমক আর বকুনি দিচ্ছে।

গর-র-র!

বাঘটা অবজ্ঞা ভরে আর এগোলো না। আমাদের দিকে লাল গোল গোল চোখ মেলে চেয়ে দেখে একলাফে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

আর দেখা যায় না তাকে।

কেষ্টমামার গলা শোনা যায়—বন্দুক খান থাকলে আজ একটা জব্বর শিকার হইয়া যাইত গিয়া।

হোঁৎকা ধমকে ওঠে—খুব শিকারী যাহোক। এতক্ষণ তো খাপ্‌চি খাচ্ছিলে।

কেষ্টমামার পৌরুষে লাগে। সে গর্জে ওঠে—রও, রও। বাঘ একদিন শিকার কইরাই দেখাইমু, এই কেষ্ট সারকেল মিছা কথা কয় না।

বেলা বাড়ছে।

বনের মধ্যে ঢুকে পড়েছি, বের হয়ে আসতে হবে। কারণ সুন্দরবনের নদী নালা অসংখ্য, সবই যেন সমুদ্রের খাড়ি। জলও ওর লোনা। খাওয়া যায় না।

আর লোকালয়ও নেই, নোনা মাটি আর ঘন জঙ্গলে মানুষের খাদ্য কোন শস্যেরও চাষ হয় না বনের মধ্যে, এখানে বনের গাছেও কোন ফল হয় না। যা দিয়ে খিদে মিটতে পারে। এখানে হারিয়ে যাওয়া মানেই মৃত্যু।

একদিনের মত চালডাল আর কিছু খাবার জল আছে। এই একদিনে আমাদের লোকালয়ে ফিরতে হবেই।

মাঝি দুজন খাল ধরে নৌকা বাইছে।

কোথায় একপাল হরিণ চরছিল খালের ধারে একফালি সবুজ ঘাসঢাকা চরে। ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি।

নৌকার দিকে চেয়ে থাকে কালো চোখ মেলে।

হলুদ রং-এর গায়ে কালো চিত্র-বিচিত্র আঁকা, শিংগুলো লম্বা আর সূচলো। বেশ ঝাঁকড়া—বানরের দল কেওড়া গাছের ডালে উঠে পাতা ফুল খাচ্ছে, আর ডালগুলো ভেঙে ফেলছে। হরিণের দল সেই ভাঙা ডালের পাতা ঘাস খাচ্ছে। বাঁদরগুলোর সঙ্গে ওদের খুবই বন্ধুত্ব।

বাঁদরগুলো গাছের ডালে বসে ওদের পাতা ভেঙে দেয়। আর নজর রাখে দূর থেকে কোন বাঘ গুড়ি মেরে আসছে কিনা। বাঘের চিহ্ন দেখলেই বাঁদরগুলো কিচিরমিচির করে আওয়াজ দিতেই হরিণের পালও নিমেষের মধ্যে তীর বেগে দৌড়ে কোথায় চলে যায়।

মাঝি বলে—বানরের সঙ্গে ওদের খুব ভাব বাবু। হঠাৎ একটা হরিণ গাছের ডালের কাছে দাঁড়িয়ে পাতা খাচ্ছিল, একটা বাঁদর ঝুম্ করে লাফ দিয়ে হরিণের পিঠেই সওয়ার হয়ে বসল।

আর হরিণটাও তীর বেগে দৌড়তে থাকে। বাঁদরটাও পাকা ঘোড়-সওয়ারের মত হরিণটার পিঠে চেপে বসেছে। বেশ খানিকটা দৌড়াবার পর বাঁদরটা আবার একটা গাছের ডালে উঠে গেল হরিণের পিঠ ছেড়ে।

হাসছি আমরা। পীতু বলে—চিড়িয়াখানায় হরিণ অনেক আছে, এই দেখবো এখানে ?

কেষ্টমামার হাতটা যেন নিশপিশ করছে, ও বলে—উঃ বন্দুকখান্ আনতি পারলে খাওয়াইতাম তোগরে আজই হরিণের মাংস।

ওই শাসানির জন্যই বোধহয় হরিণগুলো টের পেয়ে গেছে আমাদের আসার খবর। ওরাও হলুদ রেখার মত চকিতের মধ্যে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

হোঁৎকা গর্জে ওঠে—খুব মরদ যাহোক। দিলে তো হরিণগুলোকে তাড়িয়ে ?

কেষ্টমামা বলে—দ্যাখ্ না কতো হরিণ দেখবি ? মাংস একদিন খাওয়াইমু

তোগোরে। এ শম্মা মিছা কথা কয় না।

নৌকা খাল বেয়ে চলেছে। কোথায় চলেছি জানিনা। এদিকে খাবার জল ফুরিয়ে আসছে, চালও শেষ হয়ে যাবে। হোঁৎকা বলে—এতগুলো মানুষ উপোস দিয়ে মরবো মাঝি ভাই?

মাঝিও জানেনা এরপর কি হবে। তাই বলে সে—বনবিবিরে সেলাম করুন বাবু, পাঁচপীরের কাছে মানত করেন। এ বাদাবনে তাদের দোয়াতেই সব হয়।

বেলা বেড়ে উঠেছে।

চুপ করে বসে আছি ক'টি প্রাণী। কাল রাত থেকে শরীরের উপর দিয়ে নিদারুণ ধকল গেছে। মৃত্যুর হাত থেকে ছ' দুবার ফিরে এসেছি।

উনুনে আবার খিচুড়ি চাপানো হয়েছে।

ওই আমাদের খাদ্য। ওতেও রুচি নেই। শুধু ভয় সারা মনকে ছেয়ে রেখেছে।

এই বনে সন্ধ্যা নামে অনেক আগে থেকেই। কারণ গাছগুলো মাথা তুলেছে। ঘন বন। সূর্য একটু ঢলে পড়তেই গাছের আড়ালে চলে যায়। আর আঁধার নামতে শুরু হয়। বনের রূপ তখন সুন্দর থেকে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। নৌকাটা চলেছে।

ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে আমাদের। মাঝি বলে—বুঝছি না বাবু। কি আছে বরাতে জানি না।

বনের মধ্যেই আজকের রাত না কাটাতে হয়।

বাঘও দেখেছি, এখানে রাতের অন্ধকারে বাঘের ভয়ই বেশী। হঠাৎ একটা শব্দ কানে আসে।

—খট্ খট্ খট্....

বনের চারিদিকে চুপচাপ ভাব। থমথম করছে সারা বন। মাঝে মাঝে পাখির কলরব শোনা যায় আর জলের শোঁ-শোঁ শব্দ ওঠে। কাছে বোধহয় বড় নদী আছে বনের আড়ালে। হঠাৎ ওই শব্দটা শুনে নৌকার মাঝি কান খাড়া করে বলে ওঠে।

—বাবু! শুনছেন?

ওর চোখ মুখে কি যেন খুশীর ভাব।

লোকটার কথায় আমরাও শুনতে চেষ্টা করি। ওই শব্দটা উঠছে—কোথায় দূর থেকে মানুষের কথার শব্দ ভেসে আসে। বনে যেন লোকজন রয়েছে।

আমরা নৌকার ক'টি প্রাণী ভয় পাই। কে জানে ডাকাতের দলের লোকজন বোধহয় এখনও আমাদের খোঁজখবর করছে। আর এবার ধরতে পারলে আমাদের কাউকে বাঁচতে হবে না, তাই বলে উঠি—নৌকা ফেরাও মাঝি, ডাকাতের দল।

শব্দটা আরও স্পষ্ট শোনা যায়।

খট্‌ খট্‌........মড় ড়-ড়।

বোধহয় একটা গাছকেই ওরা কেটে ফেলেছে, আর সেই কাটা গাছটা মড় মড় শব্দে ভেঙে পড়ছে বনে।

মাঝি বলে ওঠে—বাবু, বন মহাজনের লোক কাঠ কাটছে। অন্য মাঝিটা গলা দিয়ে তীক্ষ্ণ একটা সুর বের বরে—কু উ-উ-উ···মানুষের ডাক নয়, এ যেন বনের কোন জানোয়ারের ডাক। বনের ওদিক থেকেও অমনি একটা তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে আসে।

—কু উ উ উ····

অর্থাৎ তার ডাকে সাড়া দিয়েছে ওই কাঠুরের দল।····সুন্দরবনে মানুষ দূর থেকে কোন মানুষের নাম ধরে ডাকে না।

মাঝি বলে—বাবু এসব জীন পরীর রাজ্যি। এখানে ভূত পেরেতের দল ঘুরে বেড়ায়। তাই নাম ধরে ডাকলে তারাই সাড়া দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে বনের মধ্যে, আর ফেরা যাবে না।

ডাকটা আবার শোনা যায়।

খাল বেয়ে আমাদের নৌকাটা বেয়ে চলেছে তারা। হয়তো এবার অনেক মানুষের মুখ দেখতে পাবো। ডাকাতের হাত এড়িয়ে বনের বাঘের সামনে থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে এবার মানুষের মধ্যে ফিরে যাবো।

দু' একটা ছোট ডিঙ্গিও খাল দিয়ে বের হয়ে আসে। তাতে রয়েছে

খালি গা—এইটুকু কাপড় গুটিয়ে পরা কিছু কাঠুরে। ওদের হাতে ধারালো কুড়াল—টাঙ্গি।

—মদন না ?

লোকগুলো মাঝিকে চেনে। মদনও সাড়া দেয়।

—জোর বেঁচে গেছি মধুভাই। ওরা আমাদের দেখছে। বাদাবনে আমরা হারিয়ে যেতাম, হয়তো জল খাবার না পেয়ে শেষ হয়ে যেতাম। নয়তো বাঘের পেটেই যেতে হতো ডাকাতের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে।

এবার কেষ্টমামা আবার কর্মে ফিরে এসেছে। কারণ বাদাবনের এই কাঠমহাজনদের নৌকায় তার দাদাটিকেও পেয়ে গেছি।

চারিদিকে গহন বন। সুন্দরবনের এক একটা এলাকা ভাগ করা থাকে। একটা এলাকায় গাছগুলোকে ফরেস্ট বনবিভাগের লোকজন মার্কা করে দেয়, আর কাঠমহাজনরা সেই গাছগুলোকে কেটে নৌকায় করে শহরে পাঠায় করাত কলে।

নানান কিছু জিনিস, চায়ের বাক্স এসব তৈরি হয় তার থেকে। এক একটা এলাকাকে ওরা বলে 'ক্যুপ'। এক একটা ক্যুপে কাঠ কাটাই হয় কুড়ি বছর পর।

বনের এই অংশে এবার কাঠ কাটাই হচ্ছে। সাময়িকভাবে তাই এখানে কাঠের মহাজনদের নৌকা, বনবিভাগের বাবুদের বোট, কাঠুরিয়াদের নৌকা সব একটা জায়গায় বাঁধা থাকে। কাজের পর এইখানে ফিরে আসে তারা। এমনি একটা নৌকা বসতে এসে পৌঁছেছি।

....কেষ্টমামা এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল ছই-এর এককোণে। ওই নৌকা বসতের কাছে এসে একটা বড় বোটের পাটাতনে কাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চীৎকার করে ওঠে—রাধিকা না ?....তোরেই খুঁজতে এসে পরাণডারে হারাইতেছিলাম।

লোকজন জুটে যায়।

শ্রীমান রাধিকাও এসে হাজির হয়েছে আমাদের বোটে।

—তুমি কোত্থেকে এলে ?

রাধিকা দেখতে ভাই-এর বিপরীত। বেশ গোলগাল, মোটামত, কালো চেহারা, আর লিকলিকে বেতকাঠির মত ওই কেষ্টমামা।

কেষ্টমামা জানায়—কোলকাতা থনে। এরা সব পাড়ারই ছাওয়াল, কইল সুন্দরবন যাবো গিয়া, তাই ক'লাম, রাধিকাদা আছে। তোগোর বনই দেখাইমু। চলি এলাম, তা পথে কি গেরোরে বাবা।

পটল এবার লোকজন দেখে একটু ধাতস্থ হয়ে বলে—ড…ড…ডাকাতে ধরেছিল। কালাচাঁদ সর্দার!

পীতাম্বর বলে—ব্যাটা মহা পাজি, বলে কিনা এক থাপ্পড় মারবো ? লাগবে না ? বলুন আপনি—

রাধিকা দলের একজন মাতব্বর। কালীনগরের মহাজনের ম্যানেজার গোছের। একজন বাওয়ালি বলে—খুব বেঁচে এসেছেন বাবুমশায় ?

মাঝি বলে—বাঁচতে কি পারতাম ? ওই বাবুই বুদ্ধিটা বাত্‌লালো, আর কাজও করল। নালে আমাদের নৌকাখান বেঁধে নিয়ে চলছিল।

হোঁৎকা চুপ করে বসেছিল একপাশে, ও কথাবার্তা কম বলে।

রাধিকা দেখছে ওকে। বলে ওঠে রাধিকা—ভালো করেছেন, ওর হাত থেকে বাঁচা যায় না।

কেষ্টমামা বলে—হঃ, কি কইছিস ? কিষ্ট সারখেলেরে ও চেনেনি। ব্যাটার দফা গয়া করে ছাড়ুম না।

কেষ্টমামা এবার আবার ভরসা পেয়ে বীরদর্পে ফেটে পড়েছে। ও বলে —এবার বাদাবন, তগোর বাঘটারে দেখা যাক্, আর বন্দুকটা আনছস দেখছি, হরিণের মাংসও খাওয়াইমু, শিকার করণের লাগবো।

রাধিকা বলে—জঙ্গলে হরিণ, বাঘ এসব মারা নিষেধ তা জানো না ?

কেষ্টমামা তাচ্ছিল্যভরে হেসে বলে—ওসব কথা ফালাইয়া দে।

আমাদের শুধোয়—হ্যাম্ খাওয়ামু ?

—হ্যাম্! অবাক হই কথাটা শুনে।

কলকাতার হোটেলে হ্যাম অর্থাৎ শুয়োরের মাংসও নাকি চলে। কিন্তু ওই দ্রব্য কখনও খাইনি। তাই এখানে এসে শুয়োর খেতে হবে শুনে

ঘাবড়ে যাই।

কেষ্টমামা বলে—মুখ যে বোদা মাইরা গেল রে তোগোর ?

হোঁৎকা এতক্ষণ চুপ করে বসে ওর ওই ফোড়ন দেওয়া কথাগুলো শুনছিল। এমনিতে হোঁৎকার মেজাজ ভালো নেই। কালাচাঁদ ডাকাত তাকে কায়দা করে বেঁধে ফেলেছিল তাই বলে, নাহলে দায়ের এককোপে কালাচাঁদ সর্দারকেই শেষ করতো সে। তারপর যা হয় দেখা যেতো।

কিন্তু তা পারেনি। ওই কেষ্টমামার এসব কথা শুনে হোঁৎকা বলে—তাই খাবো। এখন যা আছে কিছু খেতে দাও দিকি ?

কথাটা আমাদেরও মনে হয়। কাল রাত থেকে কিছু খাওয়া তেমন হয়নি। প্রাণের ভয় আর উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে। খিদে তেষ্টার কথাও মনে ছিল না।

এবার সেই ভয়গুলো চলে যেতে খিদের কথাটা মনে পড়ে।—পেট চুঁই চুঁই করছে খিদেয়।

পীতাম্বরও কুঁই কুঁই করে।

রাধিকা মামা বুঝতে পেরে বলে—আমি দেখছি। পান্থা খাবে ?

—পান্থা ! হোঁৎকা জানায়—তপ্ত পান্থা ছাইভস্ম যা দেবে তাই খাবো।

কেষ্টমামা ভাই-এর হয়ে অভয় দেয়।—এখানে রাধিকার লগে আসছস, আর ভাবনার কাম নাই।

বৈকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে এখানের বনে আঁধার ঘনিয়ে আসে। ছোট ডিঙ্গি নিয়ে যারা বনের এদিক ওদিক কাঠ কাটতে গেছল সেই কাঠুরের দল ফিরে আসছে।

আজকের সন্ধ্যায় আমরা একটু বিশ্রাম পেয়েছি। চাঁদের আলো পড়েছে নদীর জলে, বনের গাছে পাতায় যেন রূপালী রং গলিয়ে ঢেলে দিয়েছে। সারবন্দী ছোট বড় নৌকাগুলো বাঁধা, ওদের রান্না হচ্ছে, কোন মাঝি গান গাইছে।

সারাদিন বনে প্রাণ হাতে নিয়ে ওরা কাঠ কাটে। বাঘ, সাপ, বনশুয়োরের আক্রমণ আছে। তবু এই সময়টুকু তারা সব ভুলে বাঁচতে চায়।

বনবিভাগের হাউস বোট থেকে রেডিওর সুর শোনা যায়। মনে হয় সুদূর দুর্গম বনের মাঝে আমরা নেই। কোন গ্রামেই আছি।

পীতাম্বর ছই-এর উপর বসে আছে, ও বলে—বুঝলি হোঁৎকা, অপূর্ব দৃশ্য রে! কবি বলেছেন—

এমন চাঁদের আলো
মরি যদি সেও ভালো,
এ মরণ স্বরগ সমান।

পটলা গুনগুনিয়ে গান গাইছে—ত-তুমি কেমন করে গ-গান।

হোঁৎকা ধমকে ওঠে—থামবি পটলা?

কেষ্টমামা বলে—গাইতে দে।....তা জুৎসই খ্যাটন হইব, মাছ দেখছস? ইয়া সাইজের পারসে, পায়রাতেলি আর সিলেট! খুশীতে গান গাইব না?

বিকালে দেখেছি নৌকার লাগোয়া ছোট ডিঙ্গি থেকে একটা বাওয়ালি মাথা ফেরানো জাল দিয়ে মাছ ধরছে। জালে উঠে আসছে চকচকে রূপোর পাতের মত তাজা মাছগুলো।

সেই মাছ ভাজা, ঝাল আর তরকারী দিয়ে ভাত জুটেছে। পরম তৃপ্তি ভরে খাচ্ছি। কেষ্টমামার ওই লিকলিকে দেহে এত দ্রব্য ধরে তা জানা ছিল না।

কেষ্টমামা ভাত আর এন্তার মাছ টেনে চলেছে।

রাধিকা বলে—কিষ্ট, নোনা মাছ এতো খাস না, সামলাতে পারবি না।

কেষ্ট জবাব দেয়—হঃ কি যে কইলি। এ শম্মারে চিনিস্‌নি রাধিকা। কাল শিকার কইরা মাংস খামু, তখন দেখবি খাওয়া কারে কয়?

হোঁৎকা বলে—পেট ছাড়বে।

কেষ্টমামা বলে—তোগোর মত কলকাতাইয়া ঘটি আমি নই। বুঝছস?

রাতের সুন্দরবনের দিকে চেয়ে থাকি।

টুনি বালবের মত নীল আলোর বিন্দু জ্বলছে। শুয়ে আছি ছই-এর ভিতর।

রাধিকা বলে—হরিণের চোখ জ্বলছে।

নৌকাটা দুলছে অল্প অল্প। সুন্দর একটি পরিবেশ। ঢেউ ভাঙার সুর

ওঠে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানিনা।

সকালের সোনালী আলো বনে, নদীর জলে ছড়িয়ে পড়েছে। হাজার পাখির কলরব ওঠে।

এর মধ্যেই নৌকার সব মানুষ—কাঠুরিয়াদের স্নান হয়ে গেছে। ভাত আর কুমড়ো পেঁয়াজ দিয়ে ঝোলমত, লঙ্কার ঝালে ওর রং হয়ে গেছে লালচে।

কাঠুরিয়ার দল সকালেই ভাত খেয়ে আর এক একটা মাটির মালসায় ভাত তরকারী খাবার জল নিয়ে ডিঙ্গিতে উঠছে। ওরা এইবার বনের ভিতরে ঢুকবে, কাঠ কাটবে বিকাল অবধি। অন্ধকার নামার আগেই আবার ফিরে আসবে তারা নৌকা বসতে।

কেষ্টমামা এই ফাঁকে এবার চা আর খাবার নিয়ে বসেছে। খাবার বলতে মুড়ি নাহয় চিঁড়ে।

কেষ্টমামা বলে—আজ তোগোর মাংস খাওয়ামু। ওরা কামে যাক। আমরাও ডিঙ্গি একখান লই যামু বনে।

পটলা বলে—তাই চল কেষ্টমামা।

পীতুও উৎসাহ প্রকাশ করে—একটু দেখাও যাবে বনটাকে, আর হরিণ যদি দেখতে পাই।

হোঁৎকা বলে—যেতে গেলে ওই বাওয়ালীদের কাউকে সঙ্গে নাও কেষ্টমামা।

কেষ্টমামা জানায়, কেষ্টামামারে চিনিস নি? এবার চিনবি।

হঠাৎ শান্ত বনের বুকে কলরব ওঠে।

আর্তনাদ চীৎকার এর শব্দ কানে আসে। নৌকায় আমরাও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছি।

নদীর দিকে দেখা যায় সেই ডিঙ্গিতে করে কাঠুরিয়ার দল ফিরে আসছে ওরা চীৎকার করে।

একজন বাওয়ালীকে বড় শিয়ালে নিইছে গ! বাঘের নাম করে না ওরা জঙ্গলে, বড় শিয়াল বলেই ডাকে।

রাধিকা চমকে ওঠে—তাই নাকি ?

লোকগুলো যেন সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখেছে, ওরা বলে ওঠে—কামে যাবো না বাবু! বড় শিয়ালটা মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে। ওরে আর রুখতি পারবো না।

মানুষের রক্ত মাংসের স্বাদ সব বাঘ পায় না।

অনেকে বলেন বাঘ সাধারণতঃ মানুষ মারে না। মানুষকে ভয় করে কিন্তু একবার কোনরকমে যদি মানুষের মাংস খেতে পায় তার স্বাদ ভোলে না, মানুষ মারার চেষ্টাই করবে। কারণ যে অন্য কোন প্রাণীকেই বাঘ আক্রমণ করুক না কেন, সে বেচারা দৌড় দিয়েও বাঁচার চেষ্টা করবে নাহয় শিং দিয়েও রুখবার চেষ্টা করে। নিদেন কামড়াতেও চেষ্টা করবে।

কিন্তু মানুষের শিংও নেই, কামড়াবার সাধ্য নেই। দৌড় দিয়ে বাঘের হাত থেকে পালাবার সাধ্য নেই, ফলে অন্যান্য প্রাণীদের তুলনায় সে বিনা অস্ত্রে সম্পূর্ণ অসহায়।

বাঘ এই কথাটা জেনে ফেলে, তার ভয় ভেঙে যায় তখন। তাই ম্যানইটার হয়ে ওঠে।

এ হল অন্যান্য বনের কথা। সেখানে সব বাঘই ম্যানইটার নয়। কিন্তু সুন্দরবনের জীবন অনেক কঠিন।

এখানের বনাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা জোয়ারের সময় ডুবে যায়। ফলে বাঘদের ওই জলে থাকতে হয়, শিকারও সহজে মেলে না। মেজাজ ওদের তাই উগ্র হয়ে থাকে। সেইজন্য মানুষ দেখলেই আক্রমণ করে।

তাই অনেকে বলে সুন্দরবনের সব বাঘই ম্যানইটার—নাহলে ওই গরীব কাঠুরিয়াকে আজ মেরে ফেলবে কেন? অন্যান্য নৌকার লোকজন জুটে গেছে, ওরা ভিড় করেছে ফরেস্টের বোটের সামনে।

ফরেস্ট অফিসার বলেন—এই বাঘটাকে সরাতে হবে। ও বেশ কয়েকটা মানুষ খুন করেছে।

আমরাও ঘাবড়ে যাই। ওই বাঘটাকেই কাল আমরাও দেখেছিলাম। ওটা আমাদেরও ঘায়েল করতে পারতো।

ফরেস্ট অফিসার বলেন—নেহাৎ দয়া করেই ছেড়ে দিয়েছিল তোমাদের।

কেষ্টমামা বলে—এবার ওটাকে আমিই মারবো।

বাওয়ালি, কাঠুরিয়ার দল বলে চলেছে।—আর কামে যাবো না বাবু। ব্যাটা হাঁকাড়ি দিই ফিরছে বনে বনে। রাধিকা বিপদে পড়ে। কাজ বন্ধ হয়ে যাবে, সমূহ লোকসান। ভাই, সে ওদের বোঝাবার চেষ্টা করে—ও আর কিছু করবে না।

—তিনটে মানুষেরে নিয়েছে বাবু, ও সুন্দরবনের দানো। আজ আবার সামুকে নিয়ে গেল। কাজে যাবো না বাবু। পরাণের দাম আমাদেরও আছে।

কাঠুরিয়ার দল বেঁকে বসেছে।

বনবিভাগেরও লোকসান অনেক। কাঠ-এর ওপর সরকারী রেভিনিউ আদায় হয় হাজার হাজার টাকার। কাজ বন্ধ হয়ে গেলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

ফরেস্ট অফিসারও ভাবনায় পড়েন।

ওদিকে রাধিকা বলে—সব্বোনাশ হয়ে যাবে মহাজনের।

কেষ্টমামা বলে ওঠে, ওরে আমিই খতম কইর‍্যা দিমু নে।

পারবে? রাধিকা কেষ্টমামার দিকে চেয়ে থাকে।

ফরেস্ট অফিসারও বলেন—সত্যি তাহলে খুব ভালো হয়।

—ও হয়ে যাবেনি। কেষ্টমামা অভয় দেয় ওদের।

পটলা কেষ্টমামার যোগ্য শিষ্য হতে চায়। ও বলে, কেষ্টমামা এমন কতো বাঘ মারছে।

—হঃ! কেষ্টমামা সায় দেয় ওর কথায়। সে বলে চলেছে, তুইডা দিন সবুর করেন, ছ্যাখেন ওরে কি করি।

হোঁৎকা চুপ করেই বসেছিল নৌকায়। কেষ্টমামা ওদের অভয় দিয়ে ফিরে এসেছে, এবার সেইই শিকারে যাবার তোড়জোড় করে।

আমাদের এসব ভালো লাগে না। বেশ আরাম করে ছু'চারদিন নৌকায় কাটাতাম, আর সুন্দরবনের সৌন্দর্য দেখতাম।

কিন্তু প্রথম থেকেই যাত্রা কেমন খারাপ হয়ে গেছে! তাই বলি কেষ্টমামাকে, খুব তো ডাঁট নিয়ে এলে, এখন?

কেষ্টমামা তাচ্ছিল্যভরে বলে ওঠে—তুই একটা মাদী। পুরুষ হবার লাগবো। সাহস—কারেজ এসকল জিনিস থাকবার লাগবো।

হোঁৎকা এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে ওঠে—তুমি মারতে পারবে ওই বাঘটাকে ?

কেষ্টমামা আবেগের স্বরে বলে—তোরা আমারে 'বিলিভ' করতি পারস্ নি। দেখবানি আমার এলেম। যে যে যাইবার চাও যেতে পারো।

অর্থাৎ কেষ্টমামা তার বীরত্বের সাথী হিসাবে আমাদেরও নিয়ে যেতে চায়।

পটল লজ্জা এড়াবার জন্য বলে—আমি যাবো।

গুড ! কিরে পীতে ? সমী—কেষ্টমামা আমাদেরও শুধোয়।

চুপ করে ভাবছি। আমাদের জবাব না দিতে দেখে কেষ্টমামা বলে—বুঝছি তোরা 'কাওয়ার্ড' একনম্বরের ভীতু হইছস ?

পীতু সেই বদনাম কাটাবার জন্য বলে—ঠিক আছে, যাবো।

—সাবাস। কেষ্টমামা হোঁৎকাকে চুপকরে থাকতে দেখে বলে ওঠে—হোঁৎকা তো ভয়ে জড়সড় হইয়া গেছে গিয়া।

কেষ্টমামার কথায় হোঁৎকা ওর দিকে চাইল। সে ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝেছে। কেষ্টমামার বীরত্বের পরিচয় সে জানে, এর আগে দেখেছেও, তাই জবাব দেয়—মরতে যেতে পারবো না ? তুমি শিকারের কি বোঝ যে ওই ধূর্ত বাঘটাকে মারবে ?

হোঁৎকার কথায় কেষ্টমামা ধমকে ওঠে—মুখ সামাল কইরা কথাবার্তা কবি হোঁৎকা। তোর গায়ে জোর আছে তাই ভাবস্ হক্কালরই 'না পাত্তা করবি ? যাবার সাহস নাই হেইটাই ক'।

হোঁৎকা কি ভাবছে। ওর মুখটা রাগে কঠিন হয়ে গেছে, ও বলে—ঠিক আছে যাবো।

কেষ্টমামা খুশী হয়। কিন্তু আমরা খুশী হতে পারি না। এভাবে বাদাবনে নামতে হবে ওই মানুষখেকো বাঘের সন্ধানে তা ভাবিনি।

কেষ্টমামা এখন কেউ কেটা।

সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। কেষ্টমামা ডিঙ্গিতে বন্দুক হাতে বসেছে।

পরণে পটলার গোলকিপার খেলার হাফপ্যান্ট, আর লাল জারসী। মাথায় আমার ক্রিকেট খেলার টুপিটা, হাতে রাধিকাদের দোনলা বন্দুক।

সবকিছুই ওর অপরের। নিজস্ব বলতে পৈত্রিক প্রাণটা। কাঁধের ওয়াটার বটল, ফ্ল্যাক্স সবই হোঁৎকার।

হোঁৎকা নীরব দর্শকের মত বসে আছে ডিঙ্গিতে। আমরা দল বেঁধে চলেছি সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারতে। এ কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি যে সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগার মারতে যাবো কুলে পাড়ার দত্তদের রকের এই ফুল টিম।

বড় গাং থেকে ছোট্ট একটা খাল বের হয়ে গেছে। দু'পাশে কেওড়া গরান গাছের ঘন জঙ্গল। ডিঙ্গিতে এসেছে সেদিনের দুজন কাঠুরিয়া।

কেষ্টমামা বলে—বুঝলি সাহস চাই বাঘ মারতে। ফরেস্টার ভদ্রলোক তো বলে যাবেন না এখন।

বনবিভাগের লোকজন যারা ছিলেন বোটে তাদের না জানিয়েই আমরা বনের এদিকে এসেছি। কেষ্টমামা বলে—কুলেপাড়ার পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের চীজরা যে কি সেটা এইবার ওকে জানিয়ে চমক লাগিয়ে দোব। বুঝলি হোঁৎকা—একেবারে বাঘটাকে মেরে নিয়ে গিয়ে দেখাবো ভদ্রলোককে।

হোঁৎকা ক্রমশঃ মুখ খুলছে।

ও রীতিমত এ্যাডভেঞ্চারের সন্ধান পেয়েছে। সন্ধানী চোখ মেলে ও দেখছে বনের চারিদিকে।

পীতু গুনগুনিয়ে গান ধরেছে—

এই তো ভালো লেগেছিল,
আলোর নাচন
পাতায় পাতায়।

হঠাৎ কেষ্টমামা গম্ভীরভাবে বলে—স্টপ ইট পীতে। এতো ছবিঘর সিনেমা হাউস নয়, বেলেঘাটার লেক নয়। সুন্দরবন। কিপ কোয়াইট।

পীতু চুপ করে গেল। পটলাও সমর্থন করে।

—র…রাইট। ন্ নো কবিত্ব হিয়ার।

স্তব্ধ বন। পাখীর ডাক কানে আসে। আবার সব চুপচাপ। কোনো সাড়া নেই। ডিঙ্গিটা খালের ধারে একটা গাছের নীচে এনে মাঝিরা বলে —এইখানেই মানুষটাকে বাঘে ধরেছিল বাবু। ওই যে জায়গাটায় এখনও ধস্তাধস্তির চিহ্ন রয়ে গেছে, ডালপালা ভাঙ্গা। নরম মাটিতে মানুষের পায়ের ছাপ আঁকা রয়েছে। ডালে আটকানো রয়েছে সেই হতভাগ্য লোকটার কাপড়খানা। বাঘটা এখান থেকে তাকে তুলে নিয়ে গেছে ঘন বনের মধ্যে।

কেষ্টমামা দেখে শুনে বলে—এহানে এ ব্যাটা আর নাই। কাম স্নাইরা চইলা গেছে গিয়া?

হেঁৎকা কি দেখছে। ও বলে—আশপাশে নিশ্চয়ই থাকবে কেষ্টমামা। আমরা বরং গাছে উঠে বসি। দেখা যাক বাঘটা এদিকে আসে কি না?

কেষ্টমামা বলে—হ! আইব কচু। চল, হালারে খুঁজবার লাগবো। নাম।

এই বনে নামতে চাই না। কেষ্টমামা তবু ওই হাফপ্যাণ্ট আর জারসী পরে নেমে পড়েছে বন্দুক ঘাড়ে। আমাদের অস্ত্র বলতে কুড়ুল আর ছু'-একটা বল্লম।

মাঝিরা বলে—নামবেন না বাবু।

কেষ্টমামা ধমক দেয়—নাইমা আয় কাওয়ার্ডের দল। কুলেপাড়ার নাম ডোবানোর জন্য তগোর বনে আনছি।

হেঁৎকাও নেমেছে, পিছু পিছু নেমেছি আমি পীতু আর পটলা গিয়ে দাঁড়িয়েছে কেষ্টমামার পাশে। পটলা বেশ সাহস নিয়ে বলে—ক্ কাম্ অন।

পটলার মৌকা এলে সে ইংরাজী বলে ফেলে। মাঝিদের ছ চারজনও নেমেছে বনে।

শোভাযাত্রা করে এগিয়ে চলেছি। কাদায় পা আটকে আসে মাঝে মাঝে গর্জন গরানের শূলো অর্থাৎ নাসিক্যমূলগুলো ধারালো ছুরির ফলার মত মুখ বের করে আছে।

তাতে পা পড়লে পা গেঁথে যাবে, চলবারও উপায় নেই। ছুপাশের

ঘন জঙ্গল, দিনের আলো ঢোকে না। আগে আগে চলেছে কেষ্টমামা ওই বিচিত্র সাজে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম।

একটা গাছে লম্বা লম্বা কি ফল ডাল থেকে ঝুলছে, অনেক ফল। দেখতে ছোট লাঠির মত।

মাঝি চীৎকার করে ওঠে—সরে আস্থন বাবু। শীগ্‌গীর।

কোনমতে প্রাণভয়ে ওই শূলো থেকে পা বাঁচিয়ে সরে এলাম। অজানা ভয়ে বুক কাঁপছে। শুধোলাম মাঝিকে—লম্বা লম্বা ফলগুলো কিসের? সারা গাছের ডাল ছেয়ে আছে?

মাঝি বলে—ফল! দেখেন ভালো করে।

দূর থেকে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারি ফলগুলো নড়ছে। ওগুলো বোধহয় জীবন্ত। অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

মাঝি বলে—ওসব ফল নয় বাবু, সাপ।

—সাপ্‌! চমকে উঠলাম।

মাঝি বলে—ওসব লাউডগা সাপ, ডালে ডালে ঝুলছে। শব্দ পেলেই সরে যাবে। উড়ে উড়ে এদিক ওদিকে আছড়ে পড়বে।

হেঁাৎকা বলে ওঠে—উড়ে, বাব্বাঃ!

কেষ্টমামা জানায়—স্থন্দরবনে এসব নর্ম্যাল ব্যাপার। চল ওপাশ দিয়ে এগোনো যাক। বাঘটার সন্ধান করতেই হবে। অর্থাৎ বাঘ না দেখে কেষ্টমামা অন্য কিছুই দেখতে রাজী নয়।

হঠাৎ ব্যাপারটা চকিতের মধ্যে ঘটে গেল।

বনবাদাড়-এর গাছগুলো দাপিয়ে যেন এগিয়ে আসে, একটা অস্ফুট চীৎকার শোনা যায়।

ততক্ষণে সারা দল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। আমি আবিষ্কার করি খালের ধারে পুরু পলিকাদায় ছিটকে পড়ে বেমালুম আলুর চপ হয়ে গেছি, পীতুকে চেনা যায় না। কাদা মেখে জলে ভিজে পানিভূতের মত হয়ে উঠেছে। পটলার পিঠের জামাটা নেই—উদম হয়ে সে চীৎকার করছে, আর শার্ট-টা সামনের দিকে লগবগ্‌ করে ঝুলছে।

হোঁৎকাই একটু সযুত অবস্থায় আছে।

সে চীৎকার করে, এ্যাই। দাঁড়া—পালাসনি, দাঁড়া, ভয় নেই। ওর হাতের কুড়ুলটা উপরে তুলে সে চীৎকার করে আমাদের উদ্দেশ্যে। একটু থমকে দাঁড়ালাম।

ওদিকে কেষ্টমামাকে ধরে তুলে দাঁড় করিয়েছে একজন মাঝি। ওর মাথার টুপিটাও নেই—আর হাতে জুৎসই করে ধরা বন্দুকটা উধাও। কেষ্টমামা লম্বাটে গালে হাত বুলোচ্ছে আর হাঁক পাড়ছে।

—নাইমা আয় ব্যাটারা! দেখছি তোগের কেদ্দানি।

মাঝি কাঠুরিয়ারা হাসছে বেদম।....হাসির ব্যাপারই। কিন্তু প্রথমে সেটা বুঝতে পারি না। তাই প্রাণভয়ে এইসব কাণ্ড করে বসেছিলাম। দেখে শুনে আমরাও হাসছি।

কেষ্টমামা গর্জে ওঠে—হাসছস্? এ্যাঁ—রসিকতা হইতেছে, নাইমা আয় ব্যাটারা।

যখন থেকে বনের মধ্যে দিয়ে চলেছি তখন থেকেই ওরা আমাদের আশপাশেই ছিল। সুন্দরবনে ওই লালমুখো বাঁদরদের রাজ্য। ওদের সংখ্যা অগণন।

বাঁদরের পালের ছুটো ধেড়ে বাঁদর বনের মধ্য থেকে তাক্ বুঝে বের হয়ে এসে কেষ্টমামার ওই বিচিত্রমূর্তি দেখে ওরাও এই কাণ্ড করে বসেছে।

বিদ্যুৎগতিতে ডাল থেকে নেমে এসে একটা বাঁদর কেষ্টমামার লম্বাটে বাংলার পাঁচমার্কা গালে সপাটে এক চড় কসাতেই মামা সটান উলটে পড়েছে। ভেবেছিল বোধহয় মানুষখেকো বাঘটাই বন থেকে বের হয়ে এসে ওকে একটি থাবার থাপ্পড় কসে দিয়েছে। তাইতেই ধরাশায়ী। আর একটা ধেড়ে বাঁদর ওর হাতের বন্দুকটা নিয়ে গাছের ডালে উঠে বসেছে। অন্য বাঁদরটা ওর গায়ে গোলকীপারের লাল জারসীখানা ধরে টানাটানি করে সেটাকে খুলতে না পেরে মাথার কাউন্টি ক্যাপটাই তুলে নিয়ে মাথায় চাপিয়ে গাছের ডালে গিয়ে উঠেছে। তার কাঁধে ঝোলানো রয়েছে ওয়াটার বটলটা।

সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেছে কেষ্টমামার কাছ থেকে ওই বাঁদরের পাল।

নীচে দাঁড়িয়ে কেষ্টমামাকে তড়পাতে দেখে বাঁদরগুলোও যেন গর্জে ওঠে খ্যাক্-খ্যাক্ কিচমিচ কিচমিচ—দাঁত বের করে গা চুলকোতে থাকে।

—বন্দুকটাই কেড়ে নিয়ে গেল কেষ্টমামা? হোঁৎকার কথায় কেষ্টমামা চটে ওঠে।

—তুই থাম দিকি হোঁৎকা।

হোঁৎকা হাসছে ওর অবস্থা দেখে। কেষ্টমামার গালে বাঁদরের পাঁচটা আঙুলের ছাপ ফুটে উঠেছে।

মাঝি বলে—নৌকায় ফিরে আসেন বাবু। আপনারা থাকতে ওরা নীচে আসবে না। ফিরে গেলে নীচে ওসব ফেলে দেবে।

কেষ্টমামামা বলে—গাছে উঠবো। পটলা—

হোঁৎকা জানায়—মাটিতে একচড় মেরে গেছে। গাছে উঠলে ব্যাটারা তোমার দুগালে দুই চড় মারবে।

পটলাও ব্যাপার দেখে এবার প্রতিবাদ করে—আ…আমি গ-গাছে উঠতে পারবো না ম্-ম্-মা।

—কাওয়ার্ড। কেষ্টমামা গর্জে ওঠে।

মাঝি বলে—শুধু হাতে এ বনে থাকবেন না বাবু। জায়গাটা ভালো নয়।

এবার খেয়াল হয়। বাঘও আসতে পারে। অবশ্য আমার মনে হয় যে বন্দুক কেষ্টমামার হাতে থাকাও যা, না থাকাও তাই। তারই মিথ্যা ভরসায় এতদূর অবধি এসে মস্ত ভুল করেছি। তাই ফিরে এসে ডিঙ্গিতে উঠলাম। বাঁদরগুলোও আমাদের পিছু হটতে দেখে এগাছ ওগাছ-এর ডালে ডালে আমাদের সঙ্গেই এল কিছুটা।

খালের জলে ডিঙ্গিটায় এসে উঠলাম। মনে সুখ নেই, সর্বাঙ্গের কাদা-মাটি শুকিয়ে এবার প্লাস্টার করার মত চড়চড়ে অবস্থা হয়ে গেছে। কেষ্টমামা বলে কাতরস্বরে—হ্যারে হোঁৎকা, যা হয় একটা কিছু কর। বন্দুকটা ওই বাঁদরগুলানের হাতে রাইখা যামু ক্যামনে?

চুপ করে বসে আছি ডিঙ্গিতে। ঝিমুনি আসে ডিঙ্গির দোলানিতে। এভাবে বন্দুক হারিয়ে আটকে পড়বো তা ভবিনি। বাঁদরগুলো আশপাশেই

আছে বোধহয়। ওদের কিচমিচ শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

হঠাৎ মাঝি উৎকর্ণ হয়ে ফিস্‌ফিসিয়ে ওঠে—বাবু। হরিণের পাল এসেছে।

স্তব্ধ বনের মাঝে আমরাও চুপ করে ডিঙ্গিতে বসে আছি। ওদিকের ঘন হলুদ সবুজ বনের ভিতর হরিণগুলোকে দেখে অবাক হই। ছোট বড় কয়েকটা হরিণ ঘুরছে। আর বাঁদরগুলো গাছের ডাল থেকে কেওড়া পাতা খাচ্ছে, ছোট ডালগুলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে ফেলছে হরিণগুলোর সামনে।

আমরা যে এখানে আছি সে খবর ওরা জানে না। কেষ্টমামা উসখুস করে—ওর হাতে বন্দুক থাকলে এখুনিই একটা মস্ত শিকার হয়ে যেতো। কিন্তু সব আশা উবে গেছে।

হঠাৎ শান্ত বনভূমির বুক কেঁপে ওঠে প্রচণ্ড শব্দে।—গুড়ুম্‌····ম্‌····

পাখীগুলো কলরব করে ওঠে। চকিতের মধ্যে হরিণের পালও হলুদ রেখার মত উধাও হয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে কিসের ঝটপট শব্দ ওঠে।

মাঝিরা লাফ দিয়ে নেমেছে গাছের ফাঁক দিয়ে কি দেখে।

—বাবু বন্দুকটা ফেলে দিয়েছে বাঁদরে। ওদের কে হেঁকে ওঠে।

—তাই নাকি! কেষ্টমামার শীর্ণ ধড়ে যেন প্রাণ এসেছে। সেও ছিটকে নামল কাদায়।

বাঁদরটা কিছুক্ষণ বন্দুকটাকে নাড়াচাড়া করে বিরক্ত হয়ে ফেলে দিয়েছে কাদার মধ্যে। গুলি পোরা ছিল, সেফটি ক্যাচও তুলে রেখেছিল জব্বর শিকারী কেষ্টমামা।

ছিটকে পড়ে বন্দুকটা পড়তেই একটা গুলি বের হয়ে গিয়ে হরিণের পালের একটা হরিণের পেটে লাগতেই সেটা চারপা উপরে তুলে ছিটকে পড়েছে কাদার মধ্যে, ছটফট করছে। অন্য হরিণগুলো নিমেষের মধ্যে হাওয়া।

—বাবু। হয়ে গেছে বাবু।

কেষ্টমামা বন্দুকটা তুলে ওদিকে হরিণটাকে ছটফট করতে দেখে বলে—নে। দিলাম একটাকে সাবড়ে।

কেষ্টমামা বুক টান করে বলে—বেকায়দায় লইয়া গেল বন্দুকটা। নালে

এতক্ষণ বাঘটাকেই খতম করতাম। নে—তবু মাংস খাওয়াইমু কইছিলাম। ছাখ কিষ্ট মামা কথা রাখে।

মাঝির দল কলরব করে হরিণটাকে নিয়ে পড়েছে। ওদের মধ্যে কে বলে—মরা হরিণটাকে দেখলে ফরেস্টের বাবুরা আর বাকী রাখবে না কিছু।

কেষ্টমামা গম্ভীরভাবে বলে—মাংস বানাইয়া লইয়া চল। টের পাবে না।

পটলা এতক্ষণ মনমরা হয়ে পড়েছিল। এবার হরিণের মাংস দেখে তার জিবে জল আসে। সে বলে ওঠে—থ্রি চিয়ার্স ফর কেষ্টমামা।

হোঁৎকা বলে—কেষ্টমামা নয়, বল—থ্রি চিয়ার্স ফর ম্যাক্সিমামা। ওই ব্যাটাই তো যা করার করেছে।

কেষ্টমামা গর্জে ওঠে—ভালো হইব না হোঁৎকা। এখন কাম হইবে তাই হাবি জাবি কথা কস্ না? নিজে স্যুট করলাম, আমিই বানাই।

—থাম হোঁৎকা। মাংস খাবার মুডটা নষ্ট করিস না।

তবু শূন্য হাতে ফিরিনি। কেষ্টমামাও একটা কাজের কাজ করে ফিরেছে। মাঝিরা বলে—তা সাহস আছে বাবুর।

কেষ্টমামা ঘাড় নাড়ে—বলো ওদের। আজ আর হবে না। বন ডিস্টার্ব করে ফেলেছি। কাল ট্রাই নোব ওই বাঘটাকে।

—আবার আসবে বনে? হোঁৎকা বলে ওঠে।

কেষ্টমামা বন্দুক উঁচিয়ে শাসায়—টেক্ কেয়ার হোঁৎকা। খুনোখুনি হবে বোধহয় সেমসাইডে।

পীতু বলে ওঠে—চুপ কর না কেষ্টমামা। তোমার মত একটা পাকা শিকারী ওই পোলাপানের কথায় মাথা গরম করো কেন?

কেষ্টমামা বলে—ওসব কথা কয় ক্যান?

বনবিভাগের বাবুরা অবশ্য আমাদের এই ব্যাপারটার কথা জানতে পারে নি। তবু আমাদের ডিঙ্গি ফিরতে দেখে তারা বলেন—এমন ভাবে যেখানে সেখানে যাবেন না।

কেষ্টমামা বলে—নো ফিয়ার রেঞ্জার সাহেব। কেষ্ট সরখেল বাদাবনকে চেনে স্যার। তা বাঘটাকে খুঁজে পেলেন?

জানতে চায় বাঘের খবর। আর সেটা পেলেই গিয়ে খপ্ করে মেরে চলে আসবে।

রেঞ্জার সাহেব বলেন—লোক তো গেছে। দেখা যাক।

বৈকালে বসে আছি নৌকায়। গাছ-এর একটু ধার ঘেঁষে নৌকাগুলো নোঙ্গর করা। আশপাশে আরও নৌকা আছে। বেড়াবার জায়গা ওই নদীতেই। ছোট ছোট ডিঙ্গিতে এ নৌকা সে নৌকায় যাওয়া যায়। মাঝিদের কেউ কেউ নৌকা থেকেই সুতোয় বঁড়শি গেঁথে টোপ দিয়ে ফেলে রাখে। তাতে দু'একটা মাছ টোপ ধরে, কখনও।

মাঝিদের দেখাদেখি হোঁৎকাও বুদ্ধিটা বের করেছিল। সুতোর যোগাড় করতে না পেরে খানিকটা পুরোনো তারের মাথায় একটা বড় বড়শিতে একটা মাছ গেঁথে ফেলে রেখেছে। মাঝে মাঝে সেটা দেখে আসে কেউ। হতাশ হয়ে জানায়—মাছ কোথায় ?

কেষ্টমামা দুপুরে ওই হনুমানের থাপ্পড় খেয়েও ভরপেট মাংসভাত গিলে ঘুমুচ্ছে। পটলাকে বলে—পিঠে সুড়সুড়ি দিতে থাক। এবার রাজা-ভেটকী মাছ খাওয়ামু তোগোর।

—রাজা-ভেটকী ? ওর কথায় শুধোলাম।

কেষ্টমামা বলে—হঃ! কলকাতায় যা ভেটকী দেখস্ হেতু এইটুন। নোনা জলার পোক্। রাজা ভেটকী খাওয়ানর কল করছি। এ্যাই পিঠে সুড়সুড়ি দিতে থাক পটলা।

হোঁৎকা বলে—পা টিপতে হবে নাকি ? না তোমার গালে হাত বোলাবে ? চড়খানা যা জমিয়েছিল।

কেষ্টমামা ফুঁসে ওঠে—চুপ করবি হোঁৎকা ?

রাধিকাবাবুর দলের অনেকেই জেনেছে কেষ্ট সত্যিই শিকারী আর সাহসও আছে। কেষ্টমামার সেই মানখাতিরের বিপথে কেউ কোন কথা বলুক এ সে চায় না। এখনও বাঘ মারার বাকী আছে। সেটাও মারবে কেষ্ট সরখেল এ আশাও করে।

হঠাৎ কিসের শব্দে তন্দ্রা ছুটে যায়। কেষ্টমামা খবরটা পেয়েছিল

আগেই। ছোট ডিঙ্গিখানার সঙ্গে বাঁধা ওই তারের বঁড়শিতে বিরাট মাছই গেঁথে গেছে ; নোনাগাং-এর বড় বড় ভেটকি কই ভোলা মাছ এক একটা বিরাট হয়। সেই বড় মাছই গেঁথে গেছে।

ডিঙ্গিখানায় টান পড়ছে। ওদিকের জলে তোলপাড় চলেছে।

নৌকার আর সকলে ঘুমুচ্ছে। হোঁৎকার ঘুম এলে আর জাগানো যায় না। ভোঁড়....ড়....ড় শব্দে নাক ডাকছে।

কেষ্টমামা আর এক খেল দেখাবে এবার। তাই এই সুযোগ সে হারাতে চায় না। লাফ দিয়ে নৌকা থেকে ডিঙ্গিখানায় এসে নেমে বঁড়শি গাঁথা তার ধরে টানতে থাকে।

হঠাৎ জলের নীচের বিরাট সেই বন্দী জীবটা লাফ দিয়েছে। ছোট ডিঙ্গিটা বাঁধা ছিল কোনমতে বড় নৌকার সঙ্গে। ছোট্ট ডিঙ্গিটা সেই প্রচণ্ড টানে এক ঝটকা খেয়ে বের হয়ে গেল বাঁধন কেটে।

আমাদের বড় নৌকাটাও কেঁপে ওঠে ওই সময়। সেই ঝাঁকুনিতে তন্দ্রা ছুটে গেছে। আমরা উঠে পড়েছি।

কেষ্টমামার চীৎকার শোনা যায়—ধর। ধর নৌকাটারে—এ্যাইয়ো—

হোঁৎকার ঘুম ভেঙে গেছে। আমরা সবাই নৌকার ছই-এর বাইরে এসেই এই দৃশ্য দেখে শিউরে উঠেছি। বিরাট বঁড়শি গিলেছে একটা বিরাট কুমির। আর সেই অবস্থাতে কুমিরটা জলের ওপর ভেসে উঠেছে—ওর কুতকুতে লাল ভাঁটার মত চোখ—আর বিশাল হাঁ-এর মধ্যে সারবন্দী ঝকঝকে ধারালো দাঁতগুলো দেখা যায়। কুমিরটা পালাতে না পেরে ওই ছোট্ট ডিঙ্গিখানা নিয়েই ভেসে চলেছে। কুমিরটাও একটা ছোট ডিঙ্গির মত লম্বা।

ওর পুরু জমাট ডুমো ডুমো চামড়ায় ওর পিঠ-ল্যাজ অবধি ঢাকা, তাতে শ্যাওলা পড়েছে। একটা ডিঙ্গি যেন আর একটা ডিঙ্গিকে স্পিডবোটের মত টেনে নিয়ে চলেছে।

সেই চলন্ত ডিঙ্গির উপর কোনমতে হালের বাঁশ ধরে ভারসাম্য রক্ষা করে লিকলিকে কেষ্টমামা চীৎকার করছে—ধর ওরে—এ্যাই রাধিকাদা—অ-বনবাবু। লোকজন জুটে গেছে।

হোঁৎকা বলে—ডিঙ্গিতে নেমেছিল কেন ?

পীতু জানায়—ভেবেছিল মাছ-ই হবে। আর ওই টেনে তুলবে সেটাকে।

হোঁৎকা বলে—এখন যাক্ কুমীরের পেটে।

পটলার বুকটা চড়্ চড়্ করে ওঠে। ও বলে—একথাটা বলতে পারলি হোঁৎকা ? কেষ্টমামাকে এখানে রেখে যাবো ?

তবু একটা কিছু করা দরকার।

কয়েকটা ডিঙ্গি নিয়ে মাঝিরা নেমে পড়েছে। ফরেস্টের একটা বোটে চলেছি আমরা।

বিরাট গাংএ তখন কুমিরটা চক্কর দিচ্ছে, আর ডিঙ্গিটাও ওই সঙ্গে চক্কর লাগিয়েছে। কেষ্টমামা চীৎকার করে—একটা বন্দুক !

হোঁৎকা বলে—তারটা খুলে দাও নৌকা থেকে, ও ব্যাটা যেখানে যাবার বড়শি ফড়শি নিয়ে চলে যাক।

কেষ্টমামা সে চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু ওই কুমিরের রামটানে তারটা এভাবে প্যাঁচ কসে আটকে গেছে নৌকার গলুই এর সঙ্গে সেটা খোলার কায়দা নেই।

হঠাৎ কুমিরটা বুঝতে পারে এতগুলো ডিঙ্গি তাকে ঘিরে ফেলছে। তাই সেটা মরীয়া হয়ে এবার ওই ডিঙ্গিটার দিকেই তেড়ে আসে। ওর লাল চোখ দুটো কুতকুত করছে। লম্বা মুখখানা হাঁ করে তেড়ে আসছে। দিনের আলোয় ওর বিশাল মুখের মধ্যে সাজানো ঝকঝকে ধারালো দাঁতগুলো দেখা যায়।

প্রচণ্ড ল্যাজের ঝাপটা এসে ঠেকছে ডিঙ্গির গায়ে।

কুমিরটা ওই কেষ্টমামার ডিঙ্গি ছেড়ে ওপাশের একটা বোটেই ল্যাজের ঝাপটা মেরেছে। ডিঙ্গিটা কাৎ হয়ে গেছে, হয়তো আঘাতে ডিঙ্গির কাঠের জোড়গুলো খুলে যাবে। কোনমতে পাকা মাঝি সেই ঝাপটা সামলে দিয়েছে। ডিঙ্গির লোকগুলো বর্শা কুড়ুল নিয়ে তৈরী। এবার কাছে এলেই তারাও আঘাত করবে।

গাং-এ যেন নৌকা বাইচ খেলা শুরু হয়েছে।

কুমিরটা দাবড়ে বেড়াচ্ছে, পেছনে লাট্টুর মত ডিঙ্গিতে কেষ্টমামার

লিকলিকে দেহটা নিয়ে চলেছে আর বোঁ বোঁ পাক দিচ্ছে।

ফরেস্ট রেঞ্জার ভদ্রলোক ডিঙ্গিতে রাইফেল নিয়ে তৈরী হয়ে আছেন। হঠাৎ কুমিরটা এইদিকে ছুটে আসছে। মাঝে মাঝে তলিয়ে যায় সেটা। আবার কোথায় কোন ডিঙ্গির কাছে জেগে উঠে আক্রমণ করতে যায়।

এবার কুমিরটা ঠেলে উঠেছে আমাদের ডিঙ্গির কাছেই, বিরাট হাঁ করে তেড়ে আসছে।

রেঞ্জার সাহেবের রাইফেল গর্জে ওঠে।

কুমিরটা বিরাট আলোড়ন তুলে জলে ডুবে গেল। ওদিকে রাইফেলের গুলিতেই বোধহয় বড়শির তারটা কেটে যেতেই কেষ্টমামার ডিঙ্গিটা এইবার মুক্ত হয়ে যায়। আর আচমকা টান কমে যেতে কেষ্টমামা ডিঙ্গির খোলের মধ্যে চিৎপাত হয়ে পড়েছে। পড়ে পড়েই চীৎকার করে—ধরস্, ধরস্ ব্যাটারে।

কুমিরটাকে আর দেখা যায় না। গাং-এর জলে খানিকটা লাল রক্তের ছাপ ফুটে উঠল মাত্র।

কেষ্টমামা এইবার ফুঁসে ওঠে—কোন কর্মের নোস তোরা। কায়দা কইরা গাঁথলাম ব্যাটারে, এতক্ষণ লড়লাম, তরা কিনা এই কাম করলি ?

কেষ্টমামা বীরদর্পে এবার আমাদেরই শাসাতে থাকে। নিজের সেই পরিত্রাহি চীৎকার আর হাঁক ডাকের কথা ভুলে গেছে সে।

রেঞ্জার ভদ্রলোক বলে—তা সত্যি। কুমিরটাও এখানে উৎপাত করছিল। আপনি তবু কায়দা করেছিলেন ওটাকে....গুলি লেগেছে তবে কি হবে বলা যায় না।

কেষ্টমামা মাথা নাড়ে—কন মশায়, হেইটা কন্। আমি তবু মৌকা করি দিলাম। বন্দুকখান্ আমার হাতে থাকলে ব্যাটারে খতম্ কইরতাম গিয়া। দেখা যাউক !

আমরা কলকেই পেলাম না কেষ্টমামার সামনে। রেঞ্জার ভদ্রলোক ওকে নিজের বোটে নিয়ে গেলেন কফি খাওয়াবার জন্যে।

হোঁৎকা বলে—খুব বীর হয়ে গেছে কেষ্টমামা। এবার দেখবো ওকে। সাঁতার জানে না। ডুবে মরতো গাং-এর জলে। তবু তড়পানি যায় নি।

পটলা বলে—তবু···হি···হিরো বলতে হবে ?

—থামবি ! হোঁৎকা চটে ওঠে।

এখানে রামচরণের কুল্‌পি, চৈতরামের আলুকাবলীও নেই। তাই পটলাকে আমাদেরও দরকার হচ্ছে না।

পীতু বলে—খুব যে দালালি করছিস কেষ্টমামার কলকাতায় ফিরতে হবে না ?

হোঁৎকা বলে—খুব যে দরদ, তবে তোকে কফি খেতে নিয়ে গেল না কেন রে ?

কেষ্টমামার তবু দোষ দেওয়া যায় না। হঠাৎ কেষ্টমামার চীৎকার শোনা যায়—ফরেস্টের বোট থেকে। ডাকছে আমাদের।

এ্যাই হোঁৎকা—সমী—পটলা—পীতে। হ্যারি আপ্ বয়েজ। কাম অন্।

রেঞ্জার ভদ্রলোকও ডাকছেন আমাদের কফির আসরে। সুতরাং রাগ করার কিছু নেই।

নৌকাগুলো পাশাপাশি বাঁধা। পা দিয়ে টপকে এটা থেকে ওটায় তার থেকে সেটায় গিয়ে আমরা ফরেস্টের বোটে গিয়ে পৌঁছলাম। কেষ্টমামাই পরিচয় করিয়ে দেয়।

—কুলেপাড়ার এক একটি 'জুয়েল' মশায়।

রেঞ্জার ভদ্রলোকের বয়স বেশী নয়। সবে দেরাদুন থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছেন। আমাদের বলেন—দেখে খুশী হয়েছি। ছেলেদের এমনি এ্যাডভেঞ্চারাস হতে হবে। সাহস করে এই বনে এসেছেন।

হোঁৎকা বলে—পথে ডাকাতে ধরেছিল।

হাসেন ভদ্রলোক—সে খবরও শুনেছি। তুমিই তো ওই বুদ্ধি করে সরে পড়েছিলে ? কালাচাঁদ সর্দার এ অঞ্চলের নামকরা ডাকাত। পুলিশ এত চেষ্টা করেও ওকে ধরতে পারছে না।

হোঁৎকা কি ভাবছে ?

ও সেই অপমানের কথা ভোলেনি। হোঁৎকা বলে—একবার হাতে পেলে এবার একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে কালাচাঁদের সঙ্গে।

কেষ্টমামার এসব ভালো লাগে না। বলে—এখন তোগোর লইয়া ফিরতে পারলি বাঁচি।

কালাচাঁদ সর্দার এ অঞ্চলের কুখ্যাত ডাকাত। বিরাট দল নিয়ে সে ডাকাতি করে গঞ্জ গ্রাম অঞ্চলে। নদীপথে তার দলের জন্য মহাজনরা মালপত্র নিয়েও নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে না। রাতের অন্ধকারে দ্রুতগামী ছিপ নিয়ে ডাকাতের দল হানা দেয়। কয়েক মিনিটের মধ্যে যাত্রী মাঝিদের কায়দা করে মালপত্র টাকাকড়ি নিয়ে উধাও হয়ে যায়।

রেঞ্জার ভদ্রলোক বলেন—এই বনের মধ্যে কোথাও ওর আড্ডা আছে বড় নৌকায়। পুলিশ অনেক খোঁজ করেও ওর সন্ধান পায়নি। বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে এসে পড়ে শিকারের ওপর। দু'একবার ফরেস্টের বোটেও ডাকাতির চেষ্টা করেছে।

হোঁৎকা বলে—আপনারা কিছু করতে পারেন নি ?

হাসলেন ভদ্রলোক। কেষ্টমামা বলে—ই কি সোজা কথা ! তবে হ্যাঁ, পড়তো কেষ্ট সরখেলের পাল্লায়—

হোঁৎকা কি বলতে গিয়ে থামল—কেষ্টমামার রামচিমটি খেয়ে।

কেষ্টমামাকে কালাচাঁদ যে থাপ্পড় কসেছিল সেটা জানাতে চায় না।

কেষ্টমামা বলে—বাঘটারে শেষ করতি পারলে পরে ওই কালাচাঁদেরে দেখুম।

রাত্রি হয়ে গেছে। দু'দিন কাঠুরিয়ার দল বনে কাঠ কাটতে নামেনি। মাঝে মাঝে গাং-এর ধারে বাঘটার হাঁকডাকও শোনা যায়। মানুষ খেয়ে খেয়ে বাঘটার সাহস বেড়ে গেছে। তাই নৌকা বসতের আশপাশেই ঘুরছে সেটা। রাতের বেলায় সুন্দরবনের সব নৌকাকে তীর থেকে সরিয়ে এনে গাং-এর মধ্যে নোঙর করে রাখা হয়।

রাতের বেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি। অনেক রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। তারাগুলো জ্বলছে, তারই আবছা আলোয় হঠাৎ জলের মধ্যে কিসের শব্দে চমকে উঠি।

হোঁৎকা ঘুমিয়েছিল আমার চিমটি খেয়ে জেগে উঠেছে, ওকে কথা

বলতে নিষেধ করি ইশারায়। জলের দিকে চেয়ে সেও চমকে উঠেছে। গাং সাঁতরে একটা কি এসে ওপাশের ডিঙ্গিতে উঠেছে চোরের মত।

একটা শব্দে চমকে উঠি। আবছা অন্ধকারে কাদের আর্তনাদ ওঠে। কলরব করছে মাঝিরা। চোখের সামনে হলুদ রেখার মত একটা ঘুমন্ত মাঝিকে তুলে নিয়ে বাঘটা গাং সাঁতরে বনে ঢুকে কোথায় মিলিয়ে গেল।

কেষ্টমামাও লাফ দিয়ে উঠেছে। ফরেস্টের বোট থেকে দুটো গুলির শব্দ আসে। কিন্তু কোথাও কিছুই দেখা যায় না। চোরের মত এসে ডাকাতের মত বাঘটা মানুষটাকে লুট করে নিয়ে চলে গেল।

মাঝি—কাঠুরিয়ার দল শিউরে উঠেছে অজানা ভয়ে। ওরা বলে—বাঘ নয় বাবু, ও বাদাবনের শয়তান। ওই বাঘের উপর শয়তান ভয় করেছে। ও আর এখানে কাউকে থাকতে দেবে না। লোকগুলো ভয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। বাকী রাত আর কেউ ঘুমুতে পারে না। কাঠুরিয়া মাঝির দল এবার শলা পরামর্শ করে জানায়—এখানে কাজ করবো না বাবু। ই ঘোরের মধ্যে দানো এসে জুটেছে। বাদাবনে নামলে আর ফিরি আসতি হবে না।

সুন্দরবনের আতঙ্ক ওদের পেয়ে বসেছে। সারা নৌকার এতগুলো মানুষ ভাবনায় পড়েছে।

রেঞ্জার ভদ্রলোকও ভাবনায় পড়েন।

এত কাঠ কোথায় পড়ে থাকবে?

রাধিকাও বিপদে পঁড়েছে। মহাজন এতটাকার কাঠ কেটে ফেলে রেখেছে বনের ধারে, সেসব কাঠও নৌকায় বোঝাই হবে না। সমূহ লোকসান।

রেঞ্জার ভদ্রলোক বলেন—যেভাবে হোক ওটাকে শেষ করতেই হবে।

ছোটখাটো মিটিং বসে গেছে। জরুরী আলোচনা শুরু হয়েছে।

হোঁৎকা বলে—বাঘটাকে মারতে পারেন না।

রাধিকাবাবুও জানায়—একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে কাজকারবার তুলে দিতে হবে স্যার!

কেষ্টমামা বলে ওঠে—ওরে মারুম।

কাঠুরিয়াদের বলে—তোমরা কাজ কাম কর গিয়া, কাল দেখুম।

কাঠুরিয়ারা তখনও দ্বিতীয় লোকের মৃত্যুটাকে ভুলতে পারেনি। বাঘটা এবার এসে ওদের নৌকাতেই হানা দিয়েছে। তাই বলে ওরা—এটাকে আগে শেষ করেন। তবেই কাজে নামবো বনে।

চুপচাপ হয়ে গেছে মানুষগুলো। রাত তখন অনেক। হোঁৎকাই বুদ্ধিটা দেয়—বাঘটা ধারে কাছেই আছে। নদীর ধারের গাছে উঠে বসে থাকলে হয়তো দেখা যাবে। হোঁৎকা বন্দুকটা হাতিয়েছে।

আমি হোঁৎকা আর পীতু তিনজনেই পরামর্শ করে বুদ্ধিটা ঠিক করলাম। পীতু বলে—কেষ্টমামাকে বলবি না?

—না। হোঁৎকা জানায়—ওকে কেন কাউকে বলে কাজ নেই। আমরা চুপচাপ ডিঙ্গি নিয়ে গিয়ে বসবো কাল সন্ধ্যার পরই।

সারাদিন বাঘের সন্ধানে কাটল। মানুষটাকে নিয়ে গিয়ে শেষ করেছে একটা হিতাঁল বনে। আধখাওয়া দেহটা পড়ে আছে, বাঘের কোন পাত্তা নেই কোথাও।

রাধিকাবাবু বলে—দু' একদিনের মধ্যে কিছু না হলে কাজ বন্ধ করে গঞ্জে ফিরে যেতে হবে।

কাঠুরিয়ারাও তাতে খুশী, তবু প্রাণে বাঁচবে তারা। সন্ধ্যার পর কোনরকমে খাওয়া দাওয়া সেরে নৌকার লোকজন শুয়ে পড়েছে। গরম কাল।

ডিঙ্গির পাটাতনেই শুতে হয় ওদের। কেষ্টমামার সাহসে তারা শুয়ে আছে। একটা ডিঙ্গির পাটাতনে কেষ্টমামা ট্রানজিস্টারটা খুলে কালোয়াতি গান শুনছে। মাঝে মাঝে নিজেও এ্যাও ম্যাও করে সুর ভাঁজে।

কেষ্টমামা গান শুনছে আর পাটাতনে শুয়ে আছে। আমরা এই ফাঁকে গাছের মাথায় এসে উঠে সজাগ চোখ খুলে বসে থাকি। রাত হয়ে আসছে। একটু চাঁদের আলো এখানে অনেক ঝকঝকে হয়ে ওঠে।

পুরোদমে কালোয়াতি গায়ক ম্যাও ম্যাও করে চীৎকার করছে। হঠাৎ সামনের একটা ঝোপ একবার কেঁপে উঠল।

—হোঁৎকা! আমি ফিস্‌ফিসিয়ে উঠি। তার আগেই বাঘটা এক

ঝিলিক বিদ্যুতের রেখার মত তীব্র বেগে লাফ দিয়েছে নদীর ধারে বাঁধা ডিঙ্গিটার দিকে আর স্থির লক্ষ্যে এসে একেবারে আছড়ে পড়েছে নৌকার উপর। ট্রান্‌জিস্টারটায় তখন পুরোদমে খেয়াল বাজছে, বকরী তান্‌ শুরু করেছে কোন নামকরা গাইয়ে।

বাঘটা ভেবেছে বোধহয় ছাগলই ডাকছে ওখানে। তাই ছাগমাংসের লোভে মুখ বদলের আশায় ওইখানে এসে পড়েছে ছাগলের সন্ধানে।

গানের আবেশে কেষ্টমামার চোখ বুজে এসেছিল। হঠাৎ চোখ খুলেছে নৌকার দুলুনিতে। আর চোখ খুলেই দেখে সামনের পাটাতনের উপর টান টান হয়ে ওৎ পেতে বসেছে ইয়া কেঁদো একটা বাঘ, ওর দুচোখ জ্বলছে। স্থির দৃষ্টিতে বাঘটা চেয়ে দেখছে ওই রেডিওটার দিকে। ওখান থেকে ছাগল ডাক ডাকছে পরিত্রাহি স্বরে কোন ওস্তাদজী।

কেষ্টমামার ধাত ছাড়ার অবস্থা তখন। সামনেই বাঘটা গান শুনতে ব্যস্ত, তাই বোধহয় তাকে দেখেনি। আর কেষ্টমামার সারা গায়ে ঘাম ঝরছে, কোনদিকে পথ না পেয়ে কেষ্টমামা গড়িয়ে পড়ে পাটাতনের নীচে নৌকার খোলে।

বাঘটা পাটাতনের উপরে বসে আছে। খোলের মধ্যে কেষ্টমামা গড়াগড়ি খেতে খেতে হঠাৎ মোটা দড়ির মত বস্তুটাকে ঝুলতে দেখে সেইটা ধরে ফেলে। নরম রোমশ একটা লম্বামত কি, কেষ্টমামা চেপে ধরেছে বাঘের ল্যাজটাই।

বাঘটা ঠিক এই সময় লাফ মেরেছে ওই রেডিওটার উপর। কাঁধের ঝোলানো স্ট্রাপটা বাঘের গলায় ঝুলছে এদিকে ল্যাজের খানিকটা ধরে ঝুলছে কেষ্টমামা পাটাতনের নীচে। কেষ্টমামা বাঘের হাঁকানির চোটে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু হাত দুটো শক্ত হয়ে চেপে বসেছে ল্যাজে। বাঘটাও এইবার বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে মরীয়া হয়ে ডাক শুরু করে প্রচণ্ড লাফ দিয়েছে।

লোকজন জেগে গেছে ওই হুঙ্কারে। বাঘটার প্রচণ্ড লাফানির চোটে দু চারটে পেরেক দিয়ে আটকানো বাঁশের পাটাতনের খানিকটা ছিটকে উপর দিকে উঠেছে নীচে ল্যাজ ধরে কাঠ হয়ে ঝুলছে কেষ্টমামার অচেতন দেহটা।

বাঘও বিপদে পড়েছে। মুক্ত হবার উপায় নেই। ওই পাটাতন আর তার আড়ালে ঝুলন্ত কেষ্টমামার দেহখানা সমেত বাঘ রামলাফে তীরের মাটিতে এসে পড়েছে। কিন্তু পিছনের বাধামুক্ত হতে পারেনি।

বাঘটার গলায় ঝুলছে চামড়ার স্ট্র্যাপ সমেত ট্রানজিস্টার তাতে বাজছে আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রের সেই কেলোয়াতি গানের অনুষ্ঠান।

বিকট স্বরে ওস্তাদজী হুঙ্কার ছাড়ছে—সমরিয়া তু একবার আ যা—

বাঘের কানে এই খেয়াল গান শোনাবার সৌভাগ্য ওস্তাদজী যে অর্জন করেছেন তা জানেন না। বাঘ তখন গানের গুঁতোয় পরিত্রাহি চিৎকার ছাড়ছে—ওস্তাদজীও তখন হেঁড়ে গলায় সমরিয়াকে ডাকছেন।

আর বাঘের পিছনে ঝুলছে পাটাতন, তার নিরাপদ আড়ালে ভারি নোঙরের মত ঝুলছে কেষ্টমামা। নৌকার নোঙরের কাছিগুলোতে সেই পাটাতন আটকে বাঘবাবাজী নাজেহাল হয়ে গেছে।

হোঁৎকা এই সুযোগে একটা গুলি করেছে, বাঘটা তত গর্জন করছে, কাঠুরিয়ার দল প্রথমে ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। কেঁদো বাঘকে অমনি বেকায়দায় পড়তে দেখে তারাও এইবার কুড়ুল, দা, বল্লম নিয়ে এসে হানা দিয়েছে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাঘের বাঘজন্ম তারা খতম্ করে দিয়ে আনন্দে চিৎকার করতে থাকে।

রেঞ্জার ভদ্রলোককে গুলিও চালাতে হয়নি। কাঠুরিয়াদের হাতেই মানুষখেকো বাঘ খতম।

ততক্ষণে কেষ্টমামার হুঁশ ফিরেছে। বাঘ-এর ল্যাজ-এ বন্দী হয়ে কাদায় পলিতে সে লুটোপটি খেয়েছে, কিন্তু এবার সে ব্যাপারটা বুঝে বীরদর্পে হুঙ্কার ছাড়ে—কিরে হোঁৎকা, কই নাই হালারে আমিই খতম করবো। তাই কায়দা কইরা দিলাম ল্যাজে মোড়া, এইসা মোড়ন দিলাম রে মুশায়—বাঘ এখন বুঝুক।

রেঞ্জার ভদ্রলোক বলেন—সত্যি। ওভাবে বাঘটাকে না আটকালে ওকে মারা যেত না।

কেষ্টমামারই জয়-জয়কার। হোঁৎকা বলে—ঝড়ে কাক মরে ফকিরের

কেরামতি বাড়ে। উনি দাঁতকপাটি লেগে ল্যাজে ঝুলছিলেন, গুলি করলাম আমি আর বাঘ মারলো কিনা কেষ্টমামা।

কেষ্টমামা একগাল হেসে বলে—তুই এসবের কি বোঝাস রে মুখ্যু। বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।

পটলও সায় দেয়—হক্ কথা। ঋষি বাক্য—

হোঁৎকা শোনায়—শেষটা জানিস তো? শশকেন নিপাতিতঃ। বাঘ মারলো কিনা খরগোস! তা কেষ্টমামা তাহলে খরগোস। কি বলিস?

কেষ্টমামা তখন বাঘ মারার জন্য বনবিভাগের সরকারী খাতায় নাম তোলাতে ব্যস্ত। আর সেটাও হয়ে গেছে। তাই বলে ওঠে কেষ্টমামা —বুঝলি সরকারী খাতায় নাম পাকা হইয়া গ্যাছে গিয়া। কিলার অব্ এ ম্যানইটার শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সরখেল। তোগোর কথায় কি হইব? হালায় একথা জজেও মান্‌বো।

পরক্ষণেই হুঙ্কার ছাড়ে বাঘের মত ভরাটি গলায়—কি রে রাধিকা দা, কই নি হালারে শ্যাস্ করুম। ছ্যাখ। মরদকা বাত্—

কাঠুরিয়ার দল কলরব করছে। তাদের আতঙ্ক দূর হয়েছে। বাঘের চামড়া ছাড়াচ্ছে তারা, কয়েকটা মশালের আলো জ্বলছে।

রাধিকাও খুশী হয়েছে। যাহোক এবার নিরাপদে কাজ করতে পারবে তারা।

রেঞ্জার ভদ্রলোকও খুশী হয়েছেন। তাঁর ক্যাম্পে কাজ বন্ধ হবে না। তাই বলেন—তোমাদের জন্যই এটা সম্ভব হল, আর হোঁৎকাও খুব সাহসী, কেষ্টমামাও তেমনি।

পটলা বলে ওঠে—ক....ক....কুলে পাড়ার পঞ্চ-পাণ্ডব ক্লাবের ন....নামটা ও কা....কাগজে দেবেন স্যার। কি....কি লিং রয়েল বেঙ্গল টাইগার ইন.... সু....সু....

—সুন্দরবন! পীতু বাকীটা যোগান দেয়।

রেঞ্জার সাহেব বলেন—থাকবে, তোমাদের নামও থাকবে।

সকাল হতেই কাজ শুরু হয়েছে পুরোদমে। মানুষখেকো বাঘটা কাল রাতে খতম হয়ে গেছে বলে আর কাজ করার কোন বিপদ নেই।

কাঠ মহাজনরাও খুশী, খুশী হয়েছেন রেঞ্জার ভদ্রলোকও। কাঠুরিয়াদের কাছে আমরা ক'জন মাননীয় অতিথি। কেষ্টমামা লিকলিকে দেহ আর ছ ইঞ্চি বুক চিতিয়ে এখানে ওখানে ঘুরছে।

নৌকাবসতের মহাজনরা খুশি হয়ে আমাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করেছে। কারা নৌকা নিয়ে আবাদের গঞ্জে চলে গেছে। ছাগল-মিষ্টি-আনাজপত্র আনতে। ঘিও এখানে ভালো পাওয়া যায়।

সমিরুদ্দি বলে—বিরিয়ানিই বানাবো বাবু। আমার হাতের গোশ্‌ত খেলে বুঝবেন কেমন পাকানি আমি।

কেষ্টমামার বিরিয়ানি মাংসের নাম শুনে জিভে জল আসে।

হোঁৎকা বলে—বেশী খেওনা কেষ্টমামা। নোনা জল এখানকার। বেশী খেলে বদ-হজম হয়ে যাবে।

কেষ্টমামা ফোঁস করে ওঠে—তোগোর মত কলকাতাইয়া আমি নই বুঝছস? যে শিঙিমাছের ঝোল পটল দিয়া আর ছুগা ভাত খামু।

পটলও বলে—ক....কারেক্ট।

ফরেস্ট অফিসের বোটে মহাজনরা টাকা জমা দিচ্ছে, নোতুন প্যারমিটের জন্য। এখন আবার বনের কাজ পুরোদমে চালু হয়ে গেছে।

এদিকে কাছাকাছি গঞ্জের হাট থেকে গোটাছুয়েক খাসি আর মিষ্টি আনাজপত্র এনে রান্নাবান্নার কাজ শুরু হয়ে গেছে। নদীর ওদিকে বিরাট নৌকায় সাইজমত কাঠের গুঁড়িগুলো সাজিয়ে সাজিয়ে বোঝাই করছে কাঠুরিয়া মাঝির দল। ওই কাঠ যাবে গঞ্জ হয়ে কলকাতার করাত কলে।

খাওয়া-দাওয়া সুরু হয়েছে। বাদাবনে বসে এমন রাজভোগ জুটবে তা ভাবিনি। সমীরুদ্দি মিথ্যা কথা বলে নি। কলকাতার হোটেলের রান্নার চেয়ে তার রান্না অনেক উঁচু দরের। বাতাসে মাংসের কারির খোসবু উঠছে। বিরিয়ানী যা রেঁধেছে তাও উৎকৃষ্ট।

হোঁৎকা কেষ্টমামার দিকে চেয়ে বলে—আর খেয়ো না কেষ্টমামা।

কেষ্টমামা মাংসের হাড্ডি চুষতে চুষতে বলে—ক্যান খামু না? তোগোর মত কি পক্ষীর আহার কইরা থাকি? আমার ঠাকুর্দায় একটা পাঁঠা আস্ত খাইত, বোঝস? সেই ফ্যামিলির মানুষ হইয়া খামু না?

রেঞ্জার ভদ্রলোক বলেন—না, না। খান আপনি।

কেষ্টমামার সারা দেহটা যেন চিমনীর মত ফাঁপা। মাংস বেশ খানিকটা উদরস্থ করে এবার গঞ্জের রসগোল্লা নিয়ে পড়েছে। চোখ ঠিকরে বের হয়ে আসে তবু রসগোল্লা গ্রাস করার কাজে বিরাম নেই।

পটলা বশংবদ ভক্তের মত বলে—ক ফিট মা ম্ মা !

কেষ্টমামার মুখ দিয়ে একটা গোঁ-গোঁ আওয়াজ বের হল মাত্র, চোখদুটো রসগোল্লার মত ড্যাবা ড্যাবা করে পটলার দিকে চেয়ে একটা শাসানির কাঠিন্য ফুটিয়ে তুলে আবার রসগোল্লা ছুঁড়তে থাকে।

খাওয়ার পর এবার কোনরকমে আমাদের নৌকায় এসে পাটাতনের উপর চিৎ হয়ে পড়ল। হুঙ্কার ছাড়ে—জল দে পটলা।

উঠে বসার সাধ্য নেই। তাই শোনায়—মুখে ঢাইলা দে। কক্ কক্ শব্দে জল গিলতে থাকে। পেটটা জয়ঢাকের মত ফুলে উঠেছে ওর। আমি বলি—ভিতরে শোবে না ?

—না। বাঘটারে মারছি। আবার ভয়টা কিসের র‍্যা ?

সকালের জোয়ারে বের হবো আমরা। ফরেস্টের বোটও গঞ্জের বন আপিসে যাবে রেভিনিউ-এর টাকা জমা দিতে।

আজ সুন্দরবনে আমাদের শেষ রাত্রি। খাওয়ারও চাপ হয়েছে। তাই যেন ঘুম আসে না। তারাগুলো জ্বলছে অন্ধকার বনে বনে রাত নেমেছে।

কাল এখান থেকে আমরা চলে যাবো কলকাতার হৈ-চৈ-এর মধ্যে। এই কদিন পর হঠাৎ বনকে ছেড়ে যাবার কথা ভেবে আজ দুঃখ হয়।

ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই। আজ সকলেই নিশ্চিন্ত। মানুষখেকো বাঘের ভয়ে ক'দিন ওরা ঘুমুতে পারেনি। সেই ভয় গেছে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর তাই আজ ওরা সকলেই নিশ্চিন্ত ঘুমের মধ্যে ঢলে পড়ে। ঘুম আসেনি আমার। চুপ করে নৌকার পাটাতনে শুয়ে আছি। রাতের হিমেল হাওয়ায় চোখ বুজে আসে।

কেষ্টমামার অবস্থা কাহিল, পেট জয়ঢাকের মত ফুলে উঠেছে—হাঁস-ফাঁস করছে পড়ে পড়ে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কিসের শব্দে চমকে উঠলাম। উঠতে

যাব, কে হুঙ্কার ছাড়ে।

—উঠলেই শেষ করে দিবি গুপী। কোন ব্যাটাকে নড়তে দিবি না।

গলার স্বরটা চেনা। খন্‌খনে গলাটা শুনে চমকে উঠি। সেদিনের ডাকাতের দলের নৌকায় ওকে দেখেছিলাম। ওপাশে লম্বা ছিপখানা ভাসছে, তার থেকে কালো মুষকো লোকটা গর্জন করে এক লাফে বনবিভাগের নৌকায় উঠেছে। তারার আলোয় চিনতে পারি ওই ছায়া-মূর্তিটাকে।

হোঁৎকাও জেগে উঠেছে। ও দেখেছে ওই লোকগুলোকে। ওই কালো কালো দানবের দল আজ রাতের অন্ধকারে এসে নৌকাবসতে মহাজনের নৌকা—ফরেস্টের নৌকায় হানা দিয়েছে।

হোঁৎকা ওই লোকটাকে ভোলেনি। তাই চিনতে পেরে ফিসফিসিয়ে ওঠে—কালাচাঁদ সর্দার—না? ব্যাটা এখানেও হানা দিয়েছে? হোঁৎকার মুখ চোখ কঠিন হয়ে ওঠে।

কালাচাঁদ সর্দার এসব খোঁজ-খবর রাখে। ওর চর-অনুচর সর্বত্র। এই কাঠুরিয়াদের মধ্যে ও ওর দলে খবর পৌঁছে দেবার লোকের অভাব নেই। তারাই কেউ খবরটা দিয়েছে।

এবার অনেক টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে কাঠমহাজনদের কাছ থেকে, আর মহাজনরা কাজ করবার জন্য টাকা এনেছে, তাছাড়া আজই গঞ্জ থেকে কাঠুরে মাঝিদের সাপ্তাহিক চাল, ডাল, তেল সব এসেছে।

....তাই রাতের অন্ধকারে দলবল নিয়ে এখানে এসে হানা দিয়েছে বাদাবনের আতঙ্ক ওই কালাচাঁদ সর্দার।

ওদের এই আচমকা হানা দেবার ফলে কেউ তৈরী হতে পারেনি।

ফরেস্ট গার্ডদের নৌকায় ঢুকে সহজেই তাদের কাবু করে ফেলেছে। নিষ্ঠুর কালাচাঁদ-এর দল মারধোরও শুরু করেছে তাদের।

গর্জে ওঠে—বল টাকাকড়ি কোথায় রেখেছিস?

লোকগুলো মার খেয়েও কিছু বলতে চায় না।

—জানি না!

কালাচাঁদ গর্জে ওঠে—ফের মিছে কথা? মার শালাকে—

নিজেই কাকে সপাটে লাথি কসে দেয়। লোকটা নৌকার মধ্যে ছিটকে পড়ে। ওরা তখন ফরেস্ট রেঞ্জারের ঘরে ঢুকে পড়েছে। রাইফেলটা হাতিয়ে নিতেও দেরী হয় না।

তারপরই লোহার সিন্দুকটা ভাঙ্গার জন্য কুড়ুল চালাতে থাকে।

কলরব—আর্তনাদ উঠছে। কিন্তু গহন বনে বাঁচাবার কেউ নেই।

আমরা কজন নৌকার পাটাতনে পড়ে আছি। কেষ্টমামার নড়ার কায়দা নেই। পেটটা বিরাট জালার মত ফুলে উঠেছে। ও বলে—আজ আর বাঁচনের পথ নাই হোঁৎকা। শেষ দিনেই এমনি কাণ্ড বাধবো কে জানতো রে ? ব্যাটা শ্যাস্ কইরা দেবানি ?

হোঁৎকা ওকে চাপা স্বরে ধমক দেয়—চুপ করে থাকো।

ওদিকে কালাচাঁদের দল কাঠুরিয়া, ফরেস্টগার্ড ও অন্যান্য লোকজনদের নির্দয়ভাবে মারছে। তাদের আর্তনাদ-এর শব্দ কানে আসে।

ওপাশের নৌকায় তারা মহাজনের লোক রাধিকাবাবুকে বেঁধেছে। তারা টাকার জন্য মরীয়া হয়ে উঠেছে।

মশালের আলোয় দেখা যায় ছায়ামূর্তিগুলো দানবের মত গর্জাচ্ছে।

আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে মার ব্যাটাকে।

দূর থেকে দেখছি আমরা। এদিকে ওরা আসেনি। আসল জায়গাতেই হানা দিয়েছে ডাকাতের দল।

হঠাৎ হোঁৎকা উঠে বসল।

আমাদের নৌকার পাশে লাগানো রয়েছে কালাচাঁদ সর্দারের দ্রুতগামী ছিপ নৌকাখানা। সরু লম্বা নৌকা। দুপাশে ছোট ছোট বৈঠা লগোনো। একসঙ্গে তিরিশ চল্লিশটা বৈঠা মেরে ওরা ওই ছিপ দিয়ে লঞ্চের চেয়েও জোরে এগিয়ে যায়। ওইটাই তাদের বাহন।

আমাদের নৌকা আটকেছিল ওই ছিপ দিয়ে।

হোঁৎকা বলে ওঠে ফিসফিস করে—ওই ছিপটায় নেমে চল সমী, কাজ শেষ করে নৌকাতে এসে উঠতে হবে। হুঁশিয়ার।

হোঁৎকার মাথায় কিছু বুদ্ধি এসে গেছে। তাছাড়া কালাচাঁদ সর্দারের সেই অপমানটা সে ভোলেনি। এও জানি কালাচাঁদ সর্দার যদি এখানে

আমাদের খুঁজে পায় আর আস্ত রাখবে না।

অন্ধকারে নোঙরের মোটা কাছি ধরে কোনমতে গিয়ে ছিপে নামলাম। নৌকার খোলে সড়কি বল্লম এসব গাদা করা ছিল। তার থেকে কুড়ুল সঙ্গে এনেছি আমরা।

হোঁৎকা বলে—কুড়ুলের ঘায়ে নৌকার জোড়মুখগুলো খুলে দে। আস্তে কোন শব্দ যেন না হয়।

—ডুবে যাবে যে ছিপটা! আমি বলি।

হোঁৎকা জানায়—তাই ডুবিয়ে দিতে হবে। ব্যাটাদের পালানোর পথ বন্ধ করে ইঁদুরকলে ফেলবো। আস্তে কুড়ুল চালা—ফুটো করে যা খোলে।

নৌকার কাছিগুলো হাতের কাছেই রয়েছে। ডাকাতের দল তখন ওদিকে নৌকায় লোকগুলোকে মারার আনন্দে মত্ত, আর লুঠ করার ব্যাপারে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা কাজ শেষ করছি।

এর আগে নৌকার তলা ফেঁসে জল ঢুকতে দেখিনি। ভিজে কাঠগুলো এমনিতেই বসেছিল। কুড়ুলের ঘায়ে সেই জোড়মুখগুলো সহজেই ফাঁক হয়ে আসছে জোরে চাপ দিতে, সেই বড় বড় ফাঁক দিয়ে ছিপের খোলে কলকলিয়ে জল ঢুকছে।

কাজ কোনরকমে শেষ করে আমরা নৌকার পাটতনে ফিরে আসছি। হঠাৎ ছায়ামূর্তিগুলোকে মালপত্র টেনে নিয়ে ছিপে উঠতে দেখে চমকে উঠি। ওরা জানে না আমরা যা করে এসেছি সেটার ফল কি হতে পারে।

হঠাৎ কে গর্জে ওঠে—ধর ব্যাটাকে!

কালাচাঁদ সর্দারকে চেনেনি এখনও।

চমকে উঠি। কালাচাঁদ সামনের নৌকায় ওই কেষ্টমামার জয়ঢাকের মত পেটটা দেখেছে। কেষ্টমামার নড়বার জায়দা নেই।

মাংস—দই—আর পণখানেক নিরেট রসগোল্লা জল সহযোগে পেটে ফুলে ফেঁপে একাকার হয়ে পাকা তরমুজের মত টলটল করছে।

পড়ে পড়েই কেষ্টমামা কাৎরাতে থাকে—কিছুই করিনি সর্দার। মাইরি কইতাছি।

—চোপ্! গর্জন করে ওঠে কালাচাঁদ। বিড়বিড় করে সে।—শালা

শয়তানের ডিম। তোকেও শেষ করে যাবো।

বিশাল মুষকো যোয়ান কালাচাঁদ। গায়ে ওর অসুরের শক্তি। কেষ্টমামার লিকলিকে দেহ আর ফুলে ওঠা জয়ঢাকের মত পেট তার কাছে কিছুই নয়। তাই এক হেঁচকা টানে ওর শরীরটাকে খড়ের আঁটির মত মাথার উপরে পট্‌কে তুলেছে।

গর্জন করে কালাচাঁদ—তুই ব্যাটা গাং-এর জলে গিয়ে ভাস্‌গে। ঘাপটি মেরে এখানে কি করছিস শুয়োরের—এ্যা এ্যা—এ্যাই—

এমন সময় কাণ্ডটা ঘটে যায়। কেষ্টমামার টই-টুম্বুর পেটে জমে থাকা মাংস রসগোল্লা বেকায়দার নাড়াচাড়ায় ছিট্‌কে আসে সবেগে মুখ দিয়ে। ছাদের আটকানো জল বাধামুক্ত হলে যেভাবে তোড়ে ছিটকে পড়ে, পেটের জমা মালও বমির প্রবলবেগে বের হয়ে এসে কালাচাঁদ সর্দারের মাথা-গা-মুখ-চোখ সব ভরিয়ে দেয়।

তখনও অফুরান স্রোত বয়ে চলেছে।

কেষ্টমামা চীৎকার করে—ওয়াক্ ওয়া-ক্ ওয়া-ক্‌ক্।

কালাচাঁদ সর্দার এমন বিপদে বোধহয় কদাপিও পড়েনি। টক বদ গন্ধওয়ালা জল আর মালপত্র হুড়হুড় করে বের হয়ে ওর চোখের মধ্যে পড়েছে। বিশ্রী উৎকট গন্ধে সর্দারের যেন বমি আসবে এইবার।

নিমেষের মধ্যে কেষ্টমামার ওই দেহটা নৌকার পাটাতনে আছড়ে ফেলে নিজে ওই বদগন্ধ ময়লা ধুয়ে মুক্ত হবার জন্য গাং-এর জলেই লাফ দেয় কালাচাঁদ।

হঠাৎ আবছা আলোয় একটা অর্তনাদ ওঠে। জলে উঠছে প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ, আমরাও ভয় ভুলে ওই বিচিত্র দৃশ্যটা দেখছি।

কালাচাঁদ সর্দার গাং-এর জলে লাফ দেবার মাত্রই ওদিক থেকে জল তোলপাড় করে এগিয়ে আসছে বিরাট কুমীরটা। সেদিন গুলি খেয়ে কোনরকমে পালিয়েছিল। কিন্তু তার রাগটা যায় নি। তাই কুমীরটা নৌকাবসতের আশপাশেই ঘুরছিল প্রতিশোধ নেবার জন্য। আজ সেই সময় এসেছে, আর হিংস্র কুমীরটাও তাক্ বুঝে তেড়ে এসেছে ওই কালাচাঁদের দিকে।

কালাচাঁদ সর্দার শিউরে উঠেছে সামনে ওই সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখে। চীৎকার করে কালাচাঁদ।

—মার। মার ব্যাটাকে।

কুমীরটা জলের মধ্যে কালাচাঁদকে এতটুকু ভয় করে না। মরীয়া হয়ে ছুটে এসে কুমীরটা কালাচাঁদের ঠ্যাং কামড়ে ধরে গাং-এর জল ঠেলে এগিয়ে চলেছে।

তখনও জলের নীচে নিয়ে যায়নি সর্দারকে। কালাচাঁদ চীৎকার করছে। আর ছিপের মধ্যে তার দলবলও গুরুজীকে বাঁচাবার জন্য জলে ওই কুমীরের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে।

আবছা অন্ধকারে নৌকা বসতের মাঝি কাঠুরিয়া সকলেই ব্যাপারটা দেখছে। ফরেস্ট রেঞ্জার ভদ্রলোকও কোনরকমে বের হয়ে এসেছেন, রাধিকাবাবুকে মেরেছে প্রচুর। সেই অবস্থাতে রাধিকাবাবু বলে ওঠে— মরুক ব্যাটা। ওর শেষ হোক। বড্ড বাড় বেড়েছিল, মেরে শেষ করেছিস, এবার নিজে মর ব্যাটা।

চীৎকার করছে কালাচাঁদ, ওর বীরত্ব হুঙ্কার সব ঘুচে গেছে, কুমীরটা টেনে নিয়ে চলেছে।

ছিপখানাও ওকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে, ভেসে চলে গেছে মাঝ গাং-এ হঠাৎ এমন সময় ছিপটা থেকে কলরব ওঠে।

—জল উঠছে ছিপে। তলা ফেঁসে গেছে—হুঁশিয়ার।

হোঁৎকা চীৎকার করে ওঠে—ওদের ছিপ ফাঁসিয়ে দিয়েছি রেঞ্জারবাবু, ডাকাতদল ডুবছে। রেঞ্জার ভদ্রলোকও শোধ নেবার জন্য তৈরী। কালাচাঁদের দলকে দল আজ ওদের হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। তাই হেঁকে ওঠেন তিনি।

সব মাঝি কাঠুরে নৌকা নিয়ে ঘিরে ফেল্, ডাকাতব্যাটাদের ঘায়েল করতে হবে।

এরাও এমনি সুযোগ পেয়ে ছেড়ে দিতে রাজী নয়। কুড়োল কাটারি বৈঠা নিয়ে শ দুয়েক মাঝি কাঠুরিয়া এবার নৌকা নিয়ে এগিয়ে গেল।

কয়েকটা পাঞ্চ নাইট, মশাল জ্বেলেছে তারা। আর কুমীরটা এই

অবকাশে কালাচাঁদ সর্দারের জ্ঞানহীন দেহটাকে একবার আসমানে ছুঁড়ে দিয়েছে, ভারি দেহটা ঘুরতে ঘুরতে নামছে—কুমীরটা বিশাল মুখ খুলে হাঁ করে আছে। ঠিক সেই মুখের মধ্যে জুৎসই অবস্থায় শিকারটাকে ধরে এবার সে জলে তলিয়ে গেল কালাচাঁদকে নিয়ে।

তখন মাঝি, কাঠুরিয়া—বনের গার্ড-এর দল নৌকা নিয়ে ওই ভাসমান ডাকাতদলকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে।

রাধিকাবাবু বলে—একব্যাটাও যেন না পালায়। সবকটাকে ঘিরে ফেল।

লোকগুলো জলে হাবুডুবু খাচ্ছে, আর নৌকার কাছে এলেই লগির ঘায়ে ওদের পিটছে কাঠুরিয়ার দল মহা উৎসাহে। ওদের এতদিনের জমা রাগটা এবার ফেটে পড়েছে।

ভরপেট গিলে আইঢাই করছিল কেষ্টমামা। কালাচাঁদের কোঁৎকার চোটে সবকিছু হড়হড়িয়ে বমি করে ওকে ভাসিয়ে দিয়েছিল! জমানো মালপত্র বের হয়ে যেতে এবার কেষ্টমামা বেশ হাল্কা হয়ে চাঙ্গা বনে গেছে।

কালাচাঁদ ওকে আছড়ে ফেলেছিল পাটাতনে, একটা পায়ে জোর চোট লেগেছে। কপালের খানিকটা কেটে গেছে। ওই কাটা কপাল আর খোঁড়া পা নিয়েই কেষ্টমামা চীৎকার করে—ছাইড়বি না, হালাগোর পিটাই লম্বা উড়াই দিবিনে।

হোঁৎকাও এই ফাঁকে নৌকা থেকে ভাসমান ওই লোকগুলোকে পিটিয়ে চলেছে।

কাকুতিমিনতি করছে তারা।

এতকাল ধরে এই এলাকায় ডাকাতি করেছে, বীরত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু এখানে ডাকাতি করতে এসে এমনি সাংঘাতিক বিপদে পড়বে তা ভাবেনি।

ছিপটাও ডুবে গেছে।

সবচেয়ে ভয় পেয়েছে তারা তাদের সর্দার কালাচাঁদের কুমীরের মুখে ওইভাবে মরায়।

ওরা আর্তনাদ করে—বাঁচান বাবু। দোহাই আপনাদের।

হোঁৎকা বলে—দড়ির ফাঁস করে এক একটাকে তোল আর আষ্টেপিষ্ঠে

বেঁধে নৌকার খোলে ফেলে নিয়ে চল থানায়।

রেঞ্জার সাহেবও সায় দেন।

—সেই ভালো।

এমন ব্যাপারটার কথা বাতাসে রটে গেছে। সারা অঞ্চলের গ্রাম গঞ্জের মানুষ কালাচাঁদ সর্দারের দলের ভয়ে শিউরে উঠতো।

সেই কালাচাঁদকে আমাদের চক্রে পড়ে যেতে হয়েছে। আর ওর দলবলকে এভাবে আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে থানায় আনতে পারবো তা কেউ ভাবেনি।

পুলিশ সাহেব স্বয়ং এসেছেন এই দৃশ্য দেখতে। সারা আবাদ গঞ্জের মানুষ ভিড় করছে থানায়।

আমাদের নৌকাগুলোকে ঘিরে ধরেছে তারা। কলরব করছে। কুলেপাড়ার পঞ্চপাণ্ডব ক্লাবের কটি সভ্যই এইসব কর্মের মূল হোতা তা জেনে ওরাও আমাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে।

পীতু বলে—সত্যি একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

পটলা ভাবের আতিশয্যে কথা বলতে পারে না। ডাকাতের দলের লোকগুলোকে বেঁধে নিয়ে চলেছে ওরা থানার দিকে।

কেষ্টমামা নৌকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ওর কপালে ফেট্টি বাঁধা, পায়ের পুরো জোর তখনও আসেনি, ল্যাংচাচ্ছে। তবু লেংড়ে লেংড়ে সে পুলিশ সাহেবের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে। রেঞ্জার ভদ্রলোক পরিচয় করিয়ে দেন আমাদের সঙ্গে সাহেবের।

তিনি বলেন—তোমাদের সাহায্য না পেলে ওই ম্যানইটার বাঘটাকে মারা যেতো না! আর এই বিরাট ডাকাতের দলকেও শায়েস্তা করা যেতো না। খুব উপস্থিত বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলে তোমরা এই ছিপখানাকে ড্যামেজ করে। আর ব্যাটা কালাচাঁদকে গাং-এ ফেলে।

হোঁৎকা চুপ করে থাকে।

কেষ্টমামাই বলে—একটুখান্ খেল দেখাইলাম স্যার। তবে এতো মাংস

—রসগোল্লা ভালো মন্দ খাইলাম, পেটে রইল না। ব্যাটা হক্কলই গুঁতাই বাইর করি দিলরে মুশায়।

পুলিশসাহেব ওর কথায় একটু অবাক হন।

কেষ্টমামা বলে—ছিপ্‌খান্ ফাঁসাইলল হোঁৎকা, আর ব্যাটা কালাচাঁদের মুখে চোক্ষে বমিতে ভাসাইলাম আমি, ব্যস। ব্যাটা গাং-এর জলে পড়লো আর অমনি—

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব দিগ্বিজয় করে এসেছে ক'দিনেই। তামাম কুলেপাড়ায় হৈ চৈ পড়ে গেছে। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হয়েছে বড় করে।

পটলা বলে—অ আমরা ন যে সে নই।

—কুলেপাড়ার লোকও ধন্যি ধন্যি করছে। পীতু জানায়।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল কেষ্টমামা। ওইসব আজেবাজে কথায় সে নেই। ভালো লাগে না। তাই গর্জে ওঠে।

—ওসব হাবিজাবি কথা থো ফালাইয়া। ব্যাটা রামশঙ্কর কি মইরা গেছে গিয়া ?

হঠাৎ রামশঙ্করকে দেখা যায় গলির মোড়ে। মাথায় বড় ডালায় ফুচকার টাল, মাঝখানে তেঁতুলজলের হাঁড়ি বগলে ফুচকাস্ট্যাণ্ড।

রামশঙ্করও আমাদের দেখে বলে—রাম রাম কিষ্টবাবু। সুন্দরবন কেমন দেখলেন ?

—রাখ তোগোর সোন্দরবন। ফুচকা বানা আগে।

কেষ্টমামা গর্জন করে ওঠে—পীতে, খবরের কাগজে ছবি ছাপছে তোগোর। আইজ ফুচ্‌কার মিটার তরেই দিবার লাগবো।

পঞ্চপাণ্ডব ক্লাব আবার জমে উঠেছে।
